রাধিকা মাথা তুলিয়া বলিল, "কোন্‌খানটায় আবার কি? হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সকল বিষয়েই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাধনায়—"

বাধা দিয়া নরেন সহাস্যে বলিল, "জ্ঞানের মধ্যে তো ঘটত্ব পটত্ব জ্ঞান; আর বিজ্ঞানের মধ্যে 'প্রতিপদে অর্থহানি কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে,' এবং হাঁচি-টিক্‌টিকী-বাধা। তারপর সাধনা—"

অনুকূল বলিল, "সাধনার প্রণালী হিন্দুধর্ম্মে যেমন সুন্দর, এমন আর কোন ধর্ম্মেই নাই। একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে একের আরোপ, এ কেবল হিন্দুশাস্ত্রকারেরাই কত্তে পেরেছেন।"

নরেন বলিল, "তাই যত নোড়া নুড়ী পাথর সব, ঈশ্বরকে চাপা দিয়ে এক এক ঈশ্বরের অবতার হ'য়ে বসে আছেন।"

অনুকূল বলিল, "কিন্তু এই নোড়া নুড়ীর মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ দেখা, জড়ের মধ্যে চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করা, সহজ জ্ঞানের কর্ম্ম নয়। একমাত্র হিন্দুশাস্ত্রকারেরাই এই জ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছিলেন।"

নরেন বলিল, "এবং আমরা শুধু সেই গর্ব্বটুকু নিয়ে এমনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি যে, সমগ্র জগতের উন্নতি-অবনতির ইতিহাসটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে উড়িয়ে দিচ্চি। আর যাঁরা জড়ের মধ্যেও ঈশ্বরের সত্তা অনুভব ক'রে গিয়েছেন, তাঁদেরই শাস্ত্র নিয়ে আমরা চেতনকেও ঘৃণার সঙ্গে ঠেলে দিতে ইতস্ততঃ করি না।"

অনুকূল বলিল, "তার মানে জাতিভেদ। কিন্তু কর্ম্মভেদে জাতিভেদ স্বাভাবিক। জাতিভেদটা কোন্ ধর্ম্মে নাই শুনি? এমন যে উদার খৃষ্টান ধর্ম্ম, তার মধ্যেও কি জাতিভেদ নাই? একজন লর্ড কি কোন চামারের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে পারে?"

নরেন বলিল, "এক টেবিলে ব'সে না খেলেও ধর্ম্মে তাকে স্বতন্ত্র

জ্ঞান করে না, ছুঁলে স্নান কত্তে যায় না। আবার সেই চামার যদি কোন দিন লর্ড হ'তে পারে, তবে তার সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু তোমার উদার হিন্দুধর্ম্মে চণ্ডাল যে, সে চিরকাল চণ্ডালই থাকবে, তা সে যতই ভাল কাজ করুক না। ব্রাহ্মণ যতই নীচ কাজ করুক না সে ব্রাহ্মণ; চণ্ডালের অন্নে জীবিকা-নির্ব্বাহ করলেও সে আপনার ব্রাহ্মণত্বের প্রভুত্বটুকু ছাড়বে না।"

অনুকূল বলিল, "তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তা হ'লে চৈতন্য-দেব যবন হরিদাসকে কোল দিলেন কিরূপে?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "তোমার হিন্দুধর্ম্ম তাকে কোল দেয় নি অনুকূলদা, সে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। তোমার উদার হিন্দুধর্ম্ম সে ধর্ম্মটাকেও একপাশে ঠেলে রেখেছে।"

অনুকূল বলিল, "তুমি বুঝতে পাচ্চো না, আচারটাই হচ্চে হিন্দু-ধর্ম্মের মুল লক্ষ্য। যার যেমন আচার, হিন্দুসমাজ তাকে তেমন স্থান দিয়েছে।"

মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "পথে এস দাদা, তা হ'লে শাস্ত্র-টাস্ত্র কিছুই নয়, আচারই হচ্চে হিন্দুর আসল ধর্ম্ম। সে আচারও আবার কত রকম, কুলাচার, দেশাচার, ইস্তক স্ত্রী-আচার পর্য্যন্ত। হিন্দু এখন বেদ, শাস্ত্র সব ছেড়ে শুধু আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরেই আপনাদের ধর্ম্মটাকে আবদ্ধ ক'রে ফেলেছে।"

রাগতভাবে অনুকূল বলিল, "তাই করেছে ব'লেই হিন্দুধর্ম্ম এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

হাসিতে হাসিতে নরেন বলিল, "মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নাই অনুকূলদা, মাথা গুঁজে কোন-রকমে আপনার অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছে।"

ক্রুদ্ধস্বরে অনুকূল বলিল, "যেখানে তোমাদের মত শত শত অনাচারী হিন্দুধর্ম্মের সে অস্তিত্বটুকুও লোপ করবার জন্য তার উপর প্রাণপণে আঘাত কচ্চে, সেখানে এইটুকু বজায় রাখাই কি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?"

নরেন হাসিয়া উত্তর করিল, "এবার আমার হার হ'য়েছে অনুকূলদা।" সকলে উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিল। নরেন গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"এবার হ'য়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে।"

রমেশ উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

"মুর্গী খাই না কেননা পাই না মটন-চপে কাজ সারি হে।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যধ্বনিতে ছাদটা ভরিয়া উঠিতেই অনুকূল রোষ-গম্ভীর দৃষ্টিতে রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে বলিল, "দেখ রমেশ, ধর্ম্মের সঙ্গে রহস্য ভাল লাগে না। আর ধর্ম্ম নিয়ে রহস্য করাও খুব বাহাদুরি নয়।"

অনুকূলের এ তিরস্কারে নরেন ছাড়া আর সকলেই মাথা নীচু করিল। অনুকূল তখন নরেনের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আজ-কাল কথায়-বার্ত্তায়, গল্পে-উপন্যাসে, গদ্যে-পদ্যে ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করাই যেন খুব একটা বাহাদুরি হ'য়ে পড়েছে। এটাও আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রধান লক্ষণ। দেখ, কোন খৃষ্টানই তার ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করে না, কোন মুসলমান ইসলামধর্ম্মের নিন্দা পরের মুখেও সহ্য কত্তে পারে না। কিন্তু আমাদের এতই অধঃপতন হ'য়েছে যে, আমরা স্বচ্ছন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের ধর্ম্ম নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কত্তে পারি।"

নরেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার কারণ হচ্চে, ধর্ম্মের উপর আমাদের

আন্তরিকতার অভাব। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম্মটাকে খুব মেনে চলেন, তাঁরাও সুবিধা অসুবিধার দোহাই দিয়ে ধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম কত্তে ইতস্ততঃ করেন না। রাগ ক'রো না অনুকূলদা, হিন্দুধর্ম্মটাকে খুব বড় ব'লে প্রচার করলেও তুমি সে ধর্ম্মের কয়টা নিয়ম মেনে চল বল দেখি?"

জোরে মাথা নাড়িয়া অনুকূল বলিল, "সেটা আমারই দোষ, সেজন্য ধর্ম্মটা দূষিত হ'তে পারে না। ধর্ম্ম যে উঁচু জিনিষ, ঠিক তাই আছে, এবং চিরকাল তাই থাকবে।"

নরেনও মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "এবং 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং' ব'লে উপদেষ্টারাও নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। তা সে থাকা-থাকিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তবে সে অবস্থায় ধর্ম্মটা নেহাৎ শূন্যগর্ভ হ'য়ে পড়বে কি না এইটাই ভয় হয়।"

অনুকূল ইহার উত্তরে কি বলিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। এমন সময় রাধিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "উঠ্‌লে যে?"

রাধিকা বলিল, "ধর্ম্ম থাক্ বা যাক্ তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু পড়ানটা বজায় রাখা চাই-ই। পাঁচটা বাজে।"

পাঁচটা বাজে শুনিয়া নরেনের যেন চমক হইল। তাহার মনে পড়িল, পাঁচটার সময় ভূপেনদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। সে চলিয়া যাওয়ায় অনুকূলের তর্কের স্রোতে ভাটা পড়িল। তাহার পরেও সে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিল, কিন্তু সভা আর জমিল না। অগত্যা সে উঠিয়া কলেজস্কোয়ারে হাওয়া খাইতে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ললিতা বলিল, "আপনার কিন্তু দশ মিনিট লেট নরেনবাবু, কেমন ভুপিদা ?"

সহাস্যে নরেন বলিল, "এ বিষয়ে ঘড়ীটাই যখন প্রধান সাক্ষী, তখন ভুপিদার সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

ললিতা বলিল, "কিন্তু আপনার এই লেটের জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন মনে করবেন না।"

চেয়ারটা টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া নরেন বলিল, "তার কৈফিয়ৎ এই যে, সাহেবদের অনুকরণ করলেও আমরা এখনও এতটা পুরা সাহেব হ'তে পারি নাই যে, মিনিট সেকেণ্ড হিসাব ক'রে চল্‌তে পারি।"

ভূপেন হাতের বইখানা মুড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু চল্‌বার চেষ্টা করা বিশেষ দরকার নয় কি ?"

নরেন বলিল, "একটুও না। তার কারণ, আপিসের ছুটীর সঙ্গেই যাদের কাজের সমাপ্তি, এবং তারপর গল্প আর তাস-পাশাই প্রধান কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়, তাদের মিনিট সেকেণ্ড হিসাব ক'রে চল্‌বার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।"

ভূপেন বলিল, "যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এতে কাজের কত ক্ষতি হয় তা জান ? মনে কর, তোমার ন'টার সময় সাক্ষাৎ কত্তে আস্‌বার কথা, কিন্তু এলে সাড়ে ন'টায়। আমার হয় তো সওয়া ন'টার সময় এমন কাজ ছিল—"

বাধা দিয়া নরেন হাত জড় করিয়া সহাস্যে বলিল, "রক্ষা কর ভূপিদা, তোমার নবেল পড়া বা হাওয়া খাওয়া কাজের কাছে আমি হার মেনে নিচ্চি। কারণ এইমাত্র অনুকূলদার সঙ্গে ধর্ম্ম নিয়ে তর্ক ক'রে আস্‌ছি, এখন আবার সময় নিয়ে তর্ক করবার শক্তি আমার নাই।"

অতঃপর সে ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন আপনি বোধ হয় এক কাপ চা দিয়ে অতিথি-সৎকাররূপ পুণ্য সঞ্চয় করবেন।"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা বলিল, "পুণ্য সঞ্চয়ের দিকে আমার যথেষ্ট আগ্রহ আছে ; আর ১৫ মিনিট পরেই আমি স্বেচ্ছায় সে পুণ্য সঞ্চয় করবো, দেখে নেবেন।"

একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া নরেন বলিল, "আপনাদের ঘড়ীতে কি সাড়ে পাঁচটায় পাঁচটা বাজে?"

হাসি চাপিয়া ললিতা বলিল, "সব সময়ে নয়, যখন কাউকে লেটের দণ্ড দেওয়া দরকার হয় তখন।"

নরেন বলিল, "দশ মিনিট লেটের দণ্ড বুঝি বিশ মিনিট?"

ললিতা বলিল, "ঠিক তাই। কারণ সাড়ে পাঁচটার সময় চম্পটী সাহেবের চায়ের টেবিলে যোগ দেবার কথা আছে।"

বিস্ময়ের সহিত নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "চম্পটী সাহেব? তিনি হন কে?"

ভূপেন বলিল, "মিষ্টার এ, সি, চম্পটী, বার-এ্যাট-ল।"

নরেন বলিল, "বাঙ্গালায় বল দাদা, এ, সি—অমরচন্দ্র, অপূর্ব্ব চন্দ্র-

ভূপেন বলিল "না না, অবিনাশচন্দ্র চম্পটী। তাঁকে চেন না?"

হাতে হাত চাপড়াইয়া নরেন বলিল, "দস্তুরমত চিনি। গোবর্দ্ধন

চম্পটীর ছেলে অবিনেশ? সে তো বি এ ফেল্ হ'য়ে ঘুরে বেড়াত। সাহেব হ'লো কবে?"

ভূপেন বলিল, "সম্প্রতি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে।"

নরেন বলিল, "বাপ অনেক জমিদারের ছেলেকে ফেল্ ক'রে কিছু টাকা করেছে কি না।"

ললিতা বলিল, "এখন আর তাঁকে অবিনাশ বাবু বল্‌বার যো নাই, মিষ্টার চম্পটী বা চম্পটী সাহেব না বল্‌লে রাগ করেন।"

নরেন বলিল, "বাঙ্গালী সাহেবদের ঐ একটা প্রধান গুণ, আসল নামের উপর একেবারে হাড়ে-চটা। ওঁদের সর্ব্বদাই ভয় যে, নামের ভিতর দিয়ে পাছে বাঙ্গালীত্বটা জাহির হ'য়ে পড়ে।"

বলিয়া নরেন হাসিয়া উঠিল। ললিতাও সে হাসিতে যোগ দিল। ভূপেন গম্ভীরভাবে বলিল, "কোন লোকের অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা কখনই ভদ্রতার অনুমোদিত নয়।"

ঘড়ীতে ঢং করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। ললিতা বলিল, "ঐ সাহেব আস্‌চেন।"

বলিয়া সে হাসি চাপিবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিল। কিন্তু ভূপেন তাহার দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখের কাপড় খুলিয়া আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

চম্পটী সাহেব ঘরের দরজায় আসিয়াই মাথার টুপীটা খুলিয়া হাতে লইলেন, এবং ললিতার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক 'গুড্‌ইভ্‌নিং,' করিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভূপেন উঠিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি ভূপেনকে

ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, এবং ললিতার দিকে হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমার জন্য বোধ হয় আপনাদের একটুও ট্রাবল্ (অসুবিধা) ভোগ কত্তে হয় নি !"

ললিতা বলিল, "কিছুমাত্র না। আপনি ঠিক সাড়ে পাঁচটায় উপস্থিত হ'য়েছেন।"

ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "হাঁ, ইংল্যাণ্ডে থাক্‌বার সময়ে এ-বিষয়ে 'হ্যাবিচুয়েট' (অভ্যস্ত) হ'তে হয়েছে। সে দেশের লোকেরা 'টাইম্'-সম্বন্ধে এমনি কেয়ারফুল' (সাবধান) যে, একটী সেকেণ্ডকেও তারা 'ভ্যালুএবল্' (মূল্যবান্) জ্ঞান করে। বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, এ দেশের কোন 'জেণ্টল্‌ম্যান' (ভদ্রলোক) গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' (সাক্ষাৎকার) কত্তে গিয়ে তিন মিনিট 'লেট্' হ'য়েছিলেন। তাতে গ্লাডষ্টোন তাঁকে ব'লেছিলেন, 'আপনি আর তিন মিনিট পূর্ব্বে এলে আপনার সঙ্গে আরও তিন মিনিট আলাপ ক'রে সুখী হ'তাম।' বাস্তবিক টাইমের অপব্যবহার আমিও 'লাইক্' (পছন্দ) করি না।"

ললিতা মৃদু হাস্য দ্বারা তাঁহার উক্তির সমর্থন করিয়া চায়ের উদ্যোগ করিতে প্রস্থান করিল। নরেন এতক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চম্পটী সাহেবের কোট-কলার-নেক্‌টাই-শোভিত সাহেবী সজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবং অবিনাশ চম্পটী যে কিরূপে এত শীঘ্র এমন পূরাদস্তুর সাহেব হইয়া পড়িল তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য অনুভব করিতেছিল। ভূপেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চম্পটী সাহেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "মিষ্টার চম্পটী, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ নাই। ইনি আমার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি। ফোর্থ ইয়ারে পড়ছেন।"

চম্পটী সাহেব সাদরে নরেনের করমর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পরিচিত হওয়ায় যে বিশেষ সুখী হইয়াছেন ইহাই জ্ঞাপন করিলেন। নরেনও শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার ভদ্রতার প্রতিদান করিতে ক্রুটী করিল না।

ভৃত্য গরম জল ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। ললিতা আসিয়া স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিবেশন করিল। চা খাইতে খাইতে চম্পটী সাহেব ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি বল্‌ছি ভূপেন, তুমি একবার বিলাত যাও। বেশী দূর না হয়, অন্ততঃ একবার ইংল্যাণ্ডটা ঘুরে এস। নতুবা তোমার জ্ঞানের বা সভ্যতার অর্দ্ধেকটা অপূর্ণ থেকে যাবে।"

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, চম্পটী সাহেবের বক্তব্যের অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল। আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।

চম্পটী সাহেবের কথার উত্তরে ভূপেন মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু নরেন যেন একটু অসহিষ্ণুভাবে উত্তর করিল, "তা হ'লে কি আপনি বল্‌তে চান যে, এদেশটা জ্ঞানে বা সভ্যতায় বিলাত অপেক্ষা হীন ?"

— ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আপনার যদি কখন বিলাত দেখ্‌বার সুযোগ হ'তো, তা হ'লে আপনি নিশ্চয়ই এমন অসম্ভব প্রশ্ন কত্তে পারতেন না। সে দেশের সঙ্গে তুলনায় ইণ্ডিয়াকে আফ্রিকার আদিম নিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"

ঈষৎ রুষ্টস্বরে নরেন বলিল, "অথচ ইয়ুরোপীয় সভ্যতার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গৌরবে, সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।"

চম্পটী সাহেব হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার যদি ইংলিস্ হিষ্ট্রী ভাল রকম পড়া থাক্‌তো, তা হ'লে কখনই এরূপ অলীক গর্ব্ব প্রকাশ কত্তে সাহসী হ'তেন না। এদেশের জ্ঞানের প্রধান নিদর্শন যে বেদ, তাকে তো ভাল ভাল ইংরাজ 'চাষার গান' ব'লে উপেক্ষা করেন।"

নরেন বলিল, "তাঁরা আমাদের মানুষ ব'লেও অস্বীকার কত্তে পারেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেই তো বাস্তবিক আমরা বন্য পশু হ'তে যাব না; আমরা যে মানুষ সেই মানুষই থাক্‌বো।"

শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "মানুষ! মাপ করবেন নরেন বাবু, বাস্তবিক মানুষ তো আমি এদেশে দেখ্‌তে পাই না।"

তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "সেটা আপনার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না। নতুবা ব্যাস-বাল্মীকির কবিত্ব-ঝঙ্কারে পূর্ণ, গোতম, কণাদ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানের গরিমায় বিমণ্ডিত, প্রেমাবতার চৈতন্য-দেবের স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র এই দেশে মানুষ দেখ্‌তে পান না, আর মানুষ দেখেছেন শুধু ঐহিক-সর্ব্বস্ব ভোগ-বিলাসের লীলাক্ষেত্র যে দেশ সেই দেশে।"

ক্রোধের উত্তেজনায় নরেনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তাহার সেই আরক্ত মুখের উপর উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, আপনার দেশের সর্ব্বপ্রধান কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য যে মহাভারত তা শুধু কুরু-পাণ্ডবদিগের কেচ্ছায় পরিপূর্ণ।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নরেন বলিল, "এটা বোধ হয় আপনার শোনা কথা। নিজে মহাভারত পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন ব'লে বোধ হয় না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "এমন কেচ্ছাপূর্ণ কাব্য পড়বার স্থযোগ যে আমার কখন হবে এমন আশাও আমি করি না, এবং সে স্থযোগ না পাওয়ার জন্ম আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই।"

ললিতা বলিল, "সেদিন একখানা মাসিকে পড়ছিলাম, মহাভারতের ন্যায় নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীতে আর নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "সেটা বোধ হয় বেঙ্গলী ম্যাগাজিন, এবং তার লেখক নরেন বাবুরই মত একজন স্বদেশভক্ত।"

গম্ভীরভাবে ললিতা বলিল, "না, সেখানা ইংরাজী মাসিক পত্র, এবং লেখক একজন ইংরাজ।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে লেখক যে নিজে মহাভারত কখন চক্ষে দেখেন নাই, কোন বাঙ্গালীর কাছে মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ গল্পমাত্র শুনেছেন একথা আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি।"

বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ললিতা বলিল, "কিন্তু আপনার এই অনুমানকে স্বদেশের বিদ্বেষ-প্রণোদিত অনুমান ছাড়া আমি আর কিছু মনে কত্তে পারি না।"

চম্পটী সাহেবের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তে সে ভাবটাকে দমন করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার এই স্বদেশভক্তি অন্ধভক্তি হ'লেও যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। তুমি কি বল ভুপেন?"

ভুপেন বলিল, "আমি যখন তোমাদের তর্কযুদ্ধের সম্পূর্ণ বাহিরে আছি, তখন আমার উপর মধ্যস্থতার ভার দেওয়া কি আমার প্রতি অবিচার করা হয় না?"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "বিরোধস্থলে বাহিরের লোকের মধ্যস্থতাই গ্রাহ্য। আপনি কি বলেন ?"

বলিয়া তিনি ললিতার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। ললিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি কিন্তু আশা করি, দাদা কখনই আপনার মতের সমর্থন করবেন না।"

ভূপেন সহাস্যে বলিল, "আমি কারো মতের সমর্থন কত্তে চাই না। তবে আমার মধ্যস্থতাই যদি গ্রাহ্য হয়, তা হ'লে আমি এইমাত্র বলতে পারি যে, ললিতার হার্ম্মোনিয়মের কাছে ব'সে এই যুদ্ধের অবসান ক'রে দেওয়া উচিত। নরেন বা চম্পটী সাহেব উভয়েই বোধ হয় আমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন।"

চম্পটী সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, "আনন্দের সহিত।"

ললিতা দাদার মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গৃহের একপ্রান্তে স্থাপিত টেবিল হার্ম্মোনিয়মের সম্মুখে গিয়া বসিল, এবং তাহার চাবি খুলিয়া, পর্দ্দায় অঙ্গুলিসংযোগ করিয়া, সুরে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কণ্ঠ প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নববধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল ; সুরের শান্ত-কোমল উচ্ছ্বাসে ঘরখানা যেন ভরিয়া উঠিল। ললিতা গাহিতে লাগিল—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনি !
নির্ম্মল-সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননী জননী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনী।"

সকলেই রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে চম্পটী সাহেবের ভ্রূযুগল যে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কুঞ্চিত হইতেছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিল না। ললিতা আবেগ-বিহ্বল-কণ্ঠে গাহিয়া চলিল—

"নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল-হিমাচল
শুভ্রতুষার-কিরীটিনী।"

চম্পটী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া নরেন বলিল, "ঐ দেখুন, মিষ্টার চম্পটী, ভূপিদার চোখ দু'টো জলে ভ'রে এসেছে। অথচ আপনি ওকেই মধ্যস্থ মান্‌ছিলেন।"

চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "গানের সুরটা সুন্দর।"

নরেন বলিল, "কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর বোধ হয় কথাগুলি।"

ভূপেন বলিল, "রবিবাবু যথার্থই একজন অসাধারণ কবি।"

চম্পটী সাহেব যেন উদাসভাবে বলিলেন, "রবিবাবু বুঝি এই রকম গান রচনা করেন?"

নরেন একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আপনি কি রবিবাবুর রচনা পড়েন নি?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "বাঙ্গালা বই পড়া আমি আদৌ পছন্দ করি না। বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি?"

ললিতা সহাস্য অথচ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তথাপি আপনি যে অনুগ্রহ ক'রে নগণ্য বাঙ্গালা ভাষাটাকে মনে রেখেছেন সেটা বাঙ্গালা

ভাষার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। কেন না অনেকে কয়লাঘাটায় জাহাজে পা দিয়েই বাঙ্গালা ভাষা ভুলে যান।"

নরেন হাসিয়া উঠিল। চম্পটী সাহেব মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। নরেন চমকিতভাবে বলিল, "সাতটা বেজে গেল, আমি এখন উঠি ভূপিদা।"

বলিয়াই নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ললিতার মুখের উপর বিদায়-প্রার্থনাসূচক সস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চম্পটী সাহেব ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার এই বন্ধুটীর ভদ্রতার প্রশংসা কত্তে পারি না।"

ভূপেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এ-বিষয়ে ওকে মাপ কত্তে হবে মিষ্টার চম্পটী; ও ছোক্‌রা বিলাতি আদবকায়দাকে সম্পূর্ণ ঘৃণা করে।"

ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "শেম্! বিলাতি আদবকায়দা আজকাল সকল সভ্যজগতের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে আদর্শকে বাদ দিলে সভ্যজগতের কাছে আমাদের কতটা খাটো হ'য়ে থাক্‌তে হবে তা জান?"

ভূপেন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ললিতা তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিল, "যতটাই খাটো হোক, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের চেয়ে একটু উঁচু থাক্‌বে বোধ হয়।"

যেন কঠোর আঘাতে চম্পটী সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার ললাটদেশ আরক্ত, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। ভূপেন বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে ললিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সে যে কি বলিয়া ললিতার উক্তির প্রতিবাদ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া চম্পটী সাহেব সহসা হাসিয়া উঠিলেন;

এবং সে হাসি সম্পূর্ণ প্রাণহীন হইলেও তাহা দ্বারাই যেন অবমাননার সঙ্কোচকে ঢাকিয়া ফেলিয়া, ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার অনুযোগটা প্রতিবাদের যোগ্য হ'লেও আমি এখন তার প্রতিবাদ কত্তে চাই না। কারণ আমার আশা আছে. আপনি একদিন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, উচ্চ আদর্শের অনুকরণ ব্যতীত কখন উচ্চ হওয়া যায় না।"

বলিয়া তিনি টুপীটা হাতে লইলেন, এবং ভূপেনের সহিত করমর্দ্দন ও ললিতাকে সহাস্য নমস্কারের সহিত 'গুড্ নাইট্' করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভূপেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে ডাকিল, "ললিতা!"

ললিতা ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ভূপেন ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "তোর এ প্রগল্ভতা কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে না।"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল, "অন্যের কাছে ক্ষমার অযোগ্য হ'লেও তোমার কাছে সে-প্রত্যাশা আমি শতবার করি দাদা।"

গম্ভীরস্বরে ভূপেন বলিল, "সেটা কি সম্পূর্ণ অন্যায় প্রত্যাশা নয়?"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "একটুও না। কারণ তুমি যে আমার দাদা।"

ভূপেনের রোষগম্ভীর মুখখানা মুহূর্ত্তে স্নেহে কোমল হইয়া আসিল।

ললিতা যথার্থই বলিয়াছিল, ভূপেন বাস্তবিকই তাহার স্নেহময় দাদা। ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক ছাড়া উভয়ের মধ্যে আরও একটা এমন সম্বন্ধ ছিল, যাহাতে তাহাদের স্নেহের বন্ধনটা অধিকতর সুদৃঢ় হইয়া আসিয়াছিল। বাপ যখন মারা যান, তখন ললিতা সাত বৎসরের বালিকামাত্র, আর ভূপেন চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেই উভয়ে মাতৃহীন হইয়াছিল। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে এই দুইটী বালক বালিকা যখন

নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িল, তখন তাহারা পরস্পরকেই আপনাদের নির্ভর আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল, উভয়ে উভয়ের স্নেহ-ভালবাসায় আপনাদের শূন্য জীবন পূর্ণ করিয়া লইল।

পিতা রমণী বাবু একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারি করিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বহুবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াও মৃত্যুকালে চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ, এবং দুই খানি বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন। উইলে তিনি এই সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাকে সমান অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পুত্র-কন্যার সাবালক অবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ভূপেন ও ললিতা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতে লাগিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভূপেন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার হাতে পাইল। সম্পত্তি পাইয়াও সে শিক্ষা ত্যাগ করিল না; বি এ পাশ করিয়া এম এ পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হইল। অনেকেই তাহাকে বিলাত গিয়া সিবিলিয়ান্ হইতে পরামর্শ দিল। ভূপেনেরও যে তাহাতে আগ্রহ ছিল না এমন নহে, কিন্তু ললিতার জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে এই আগ্রহ ত্যাগ করিতে হইল। সে চলিয়া গেলে ললিতা কোথায় থাকিবে? ললিতা যদিও সর্ব্বান্তঃকরণে ভ্রাতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিল, তথাপি ভূপেনের উন্নতি জানিয়াও সে তাহার বিলাতযাত্রায় বাধা দিল। দাদা ছাড়া সংসারে তাহার যে আর নির্ভর করিবার স্থান ছিল না। একমাত্র দাদাই যে তাহার মাতা পিতা সহোদর শিক্ষক ও সঙ্গীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং দাদাকে সে ছাড়িয়া দিতে পারিল না, দাদাও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না।

রমণীবাবু একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল, কিন্তু কন্যা সে গুণের সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইতে পারে নাই; ভ্রাতার শিক্ষা-দীক্ষাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া সে যেন অন্তরে অন্তরে অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। ভূপেন ইহাতে একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যে দিক্ দিয়া এই ভাবের প্লাবন আসিয়া ললিতার চিত্তটাকে বিভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, সে দিক্‌টা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেও এই প্লাবনের গতি রোধ করিবার শক্তি তাহার ছিল না।

ভূপেন যখন সিটী কলেজে পড়িত, তখন হইতেই নরেনের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হয়। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে অল্প-দিনের মধ্যেই নরেন তাহাকে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এমনই দৃঢ়ভাবে তাহার হৃদয়টা অধিকার করিয়া বসিল যে, তাহাকে সে স্থান হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ভূপেনের রহিল না। উভয়েই মাতৃ-পিতৃহীন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বটা ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া আসিল। কোন বাধা না থাকিলেও ললিতা সাধারণের সঙ্গে বড় একটা মিশিত না, কিন্তু দুই চারি দিনের আলাপেই সে নরেনের সঙ্গে না মিশিয়া থাকিতে পারিল না। নরেন যেন জোর করিয়া তাহাকে আপনার দিকে টানিয়া আনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বড়াই গ্রামের ভুবন মুখুজ্যের ছেলে বরেন মুখুজ্যে ও নরেন মুখুজ্যে দুই ভায়ের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া যখন মোকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইল, তখন গ্রামের অনেক লোকই দ্বিতীয় গজকচ্ছপের যুদ্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, এবং ভুবন মুখুজ্যের সযত্ন-সঞ্চিত সম্পত্তিটা যে শীঘ্রই তাহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইয়া উকীল, মোক্তার ও মহাজন নামক তিনটী সম্প্রদায়ের কবলগত হইবে এই আশায় কেহ কেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিঃস্ব ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুবন মুখুজ্যে যখন স্বীয় অধ্যবসায় ও বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় লক্ষপতি হইয়া গাংপুর মহলটা ইজারা লইলেন, তখন গ্রামের অনেক লোক তাঁহার এই অভাবনীয় উন্নতি দর্শনে শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, লোকটা ঠিক তাহাদেরই ন্যায় দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ হইয়াও কিরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সহসা এতটা উন্নতি লাভ করিল ইহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। তারপর ভুবন মুখুজ্যে ক্রমে ক্রমে যখন আরও তিন চারিটী মহলের ইজারা লইয়া একজন জমিদার হইয়া বসিলেন, তখন গ্রামের প্রবীণেরা অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিল যে, ভুবন মুখুজ্যের এই উন্নতির মূলে এমন একটা অধর্ম্ম বা জাল-জুয়াচুরী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা প্রকাশ পাইলে একদিন সকলকেই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হইবে। কারণ অধর্ম্ম ব্যতীত যে পয়সা হয় না ইহা সনাতন সত্য। ধর্ম্মপথে থাকিয়া কেহ কখন বড়লোক হইতে পারে না। ইহার প্রমাণ, সিদ্ধান্তকারীরা নিজে।

অতঃপর সিদ্ধান্তকারী বহুদর্শী প্রবীণগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন যে, অধর্ম্মের পয়সা কখনই ভোগে আসিবে না; তাহা হইলে দিবা-রাত্রি, চন্দ্র সূর্য্য সব মিথ্যা হইবে।

কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের সম্পত্তির মূলীভূত অধর্ম্মের রহস্যটা বহুদিনেও প্রকাশ পাইল না; বরং ভুবনবাবু কারবার ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। লোকে কিন্তু আশা ছাড়িল না; তাহারা ক্রিয়াকর্ম্মে দান-ধ্যানে অধর্ম্মার্জ্জিত জমিদারীর উপস্বত্বের কতকটা অংশীদার হইলেও ধর্ম্মের মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কবে এই নূতন জমিদারের জমিদারীর মূলীভূত অজ্ঞাত অধর্ম্মটা লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া এই জমিদারী, এই পাকা বাড়ী, এই দোল-দুর্গোৎসব সব উপকথার মায়াপুরীর মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবে। কিন্তু অনেকদিন অতীত হইলেও সেই প্রার্থিত দিনটা আসিল না, এবং সে অজ্ঞাত রহস্যটা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ভুবনবাবু বিস্তৃত জমিদারী এবং দুই পুত্র রাখিয়া অজ্ঞাতলোকে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিজ্ঞেরা মত প্রকাশ করিলেন, ছেলেদের হাতে যখন বিষয় পড়িয়াছে, তখন ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড়িবার আর বিলম্ব নাই। আজকালকার ছেলে, মদে মাংসে বাবুয়ানীতে তিন দিনে সব উড়াইয়া দিবে।

কিন্তু তিন দিনের স্থলে তিন বৎসরেও যখন বিষয় উড়িবার উপযুক্ত বাবুয়ানীর কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন কেহ কেহ হতাশচিত্তে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কলিতে কি ধর্ম্ম আছে? এখন অধর্ম্মেরই জয়-জয়কার!"

এইরূপে কলিতে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দর্শনে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিই যখন নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন সহসা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা দর্শনে তাঁহারা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া পড়িলেন।

বিবাদটাও নিতান্ত সামান্য কারণে বাধে নাই। সে বৎসর বাসন্তী-পূজার সময় নরেন ললিতা ও ভূপেনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। কেবল ভূপেন আসিলে বোধ হয় কোন কথাই উঠিত না, কিন্তু সেই সঙ্গে ললিতার আগমনে গ্রামের লোকেরা কেবল বিস্ময় অনুভব করিয়াই নিরস্ত রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা তুমুল আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই পনের যোল বছরের মেয়েটী যখন ভূপেন ও নরেনের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইত, মাঠের ধারে গিয়া পাঁচ বছরের মেয়ের মত ফড়িং ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিত, তখন গ্রামের পুরুষেরা সেদিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত, মেয়েরা গালে হাত দিয়া চাহিয়া থাকিত।

কিন্তু এই বিস্ময়ভাবটা স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই ইহার সঙ্গে ধর্ম্মভাবটা জাগরিত হইয়া সকলকে সচেতন করিয়া দিল। প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহসী না হইলেও ইহার বিরুদ্ধে একটা গুপ্ত আন্দোলন চলিতে লাগিল, এবং সে আন্দোলনে সমাজের অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিই যোগ দিয়া ধর্ম্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। পরামর্শ যুক্তি গোপনেই চলিল, এবং এতই গোপনে উপায় উদ্ভাবিত হইল যে, সপ্তমী পূজার দিন পর্য্যন্ত অপরে তাহার ছায়া মাত্র অনুভব করিতে পারিল না।

সপ্তমীর মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নভোজনের সময় যখন গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণকেই অনুপস্থিত দেখা গেল, তখন ছোট বড় সকল কর্ম্মচারী

হইতে বড় বাবু পর্য্যন্ত ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বড় বাবু তৎক্ষণাৎ জানকী ঘোষাল, গোকুল চক্রবর্ত্তী, সর্ব্বেশ্বর আকুলি প্রভৃতি প্রবীণ সামাজিকগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জানকী ঘোষাল পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বড় বাবুর প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়া দিলেন যে, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই বড় বাবুর আশ্রিত এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বড় বাবুর আদেশে তাহারা প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারে। কেন না বড় বাবুর মত ধর্ম্মনিষ্ঠ পরোপকারী লোক কেবল এই বড়াই গ্রামে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহস্থল। কিন্তু ছোট বাবু দিন দিন যেরূপ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে এই আনুগত্য রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছোট বাবু বিদেশে যাহাই করুন, দেশে কিন্তু খিরিষ্টানদের লইয়া এতটা মাথামাথি করা উচিত হয় না। ভ্রাতৃগতপ্রাণ বড় বাবু ভ্রাতাকে ক্ষমা করিলেও সমাজ কিন্তু এতটা উদারতা দেখাইতে পারে না; দেখাইলে ধর্ম্ম—যাহা ধনজন, এমন কি যাহা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ও মূল্যবান্ তাহা লোপ পায়। অগত্যা তাহারা পরমোপকারী বড় বাবুর অবাধ্যতাচরণ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

বড় বাবুও এই অভিযোগের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শিক্ষিত হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এতটা অনুরাগ ছিল, যাহাতে এই অনুরাগের মধ্য দিয়া অনেক সময় তাঁহার গোঁড়ামী এক আধটু প্রকাশ পাইত। সুতরাং ললিতা ও ভূপেনের উপস্থিতি যে তাঁহার বেশ প্রীতিপ্রদ হয় নাই ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘোষাল মহাশয় সত্যই বলিয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতৃগতপ্রাণ। শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অবধি

তিনি কনিষ্ঠের আদর-অত্যাচার যতটা সহ্য করিতেন, পিতাও ততটা সহিতে পারিতেন না। নরেনের সকল ত্রুটী, সকল অত্যাচার তাঁহার নিকট মার্জ্জনীয় ছিল। কনিষ্ঠের শাসক হইলেও তিনি তাহার ভীতির পাত্র ছিলেন না, প্রত্যুত শ্রদ্ধাসমন্বিত ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। এই কারণেই নরেন যখন ললিতা ও ভূপেনকে লইয়া আসিল, তখন তাহাদের আগমন নিজের প্রীতিকর না হইলেও নরেনের অনুরোধেই তিনি তাহাদিগকে সম্মানিত অতিথির প্রাপ্য আদর-আপ্যায়নে আপ্যায়িত করিতে বাধ্য হইলেন।

শুধু ইহাই নহে, এই দুইটী অতিথিকে লইয়া বাড়ীর মধ্যেও বিরুদ্ধ-ভাবের মৃদুগুঞ্জন উত্থিত হইল। কিন্তু বরেন্দ্রনাথের শাসনে সে গুঞ্জন স্পষ্ট প্রকাশ পাইল না। তাহা কেবল আন্দোলনকারীদিগের মনের ভিতরেই চাপা রহিয়া গেল। বড় বৌ মহামায়া সন্তর্পণে আপনার শুচিত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোল বাধিল কনিষ্ঠা বধূ অপর্ণার। সে যথেষ্ট সতর্কতাসত্ত্বেও যখন আপনার ও আপনার গৃহের শুচিত্ব বজায় রাখিতে পারিত না, তখন স্বামীর উপর নিষ্ফল তর্জ্জনে ইহার শোধ লইবার চেষ্টা করিত। তাহার সম্পূর্ণ সতর্কতা ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ললিতা অকস্মাৎ আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে, বিছানায় বসিলে, গৃহসামগ্রী ছুঁইয়া ফেলিলে অপর্ণা মুখে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু ভিতরের অসন্তোষটা এমনই ভাবে বাহিরে ফুটিয়া উঠিতে চাহিত যে, ভদ্রতার অনুরোধে অপর্ণাকে অনেক কষ্টে সেটুকু চাপিয়া যাইতে হইত। ললিতা কিন্তু এত দূর জানিত না; সে অপর্ণার অসন্তোষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত সখিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত।

তবে শুচিত্ব ছাড়া যদি আর একটা বাধা না থাকিত, তাহা হইলে সে ললিতার আগ্রহের মধ্যে আপনাকে ধরা না দিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই ষোল বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়েটার সঙ্গে নরেনকে হাসিয়া কথা কহিতে দেখিলে তাহার অন্তরে স্ত্রীজন-সুলভ যে হিংসাটা মাথা তুলিয়া উঠিত, অপর্ণা চেষ্টা করিয়াও সেটাকে চাপিতে পারিত না।

বাড়ীর ভিতরের এই গোলযোগটা বরেন্দ্রনাথের অগোচর না থাকিলেও বাড়ীর বাহিরে যে ইহা লইয়া গোলমাল ঘটিতে পারে ইহা তিনি তলাইয়া বুঝেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন রোষে ক্ষোভে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখন ক্রোধ প্রকাশের সময় ছিল না; তখন একদিকে আপনার সামাজিক সম্মান রক্ষা, অন্য দিকে ভ্রাতার ও অতিথির মর্য্যাদা রক্ষা এই উভয়বিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই উভয় সঙ্কটে পুরোহিত সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সম্মানস্বরূপ এক এক টাকা দক্ষিণা লইয়া মধ্যাহ্নভোজন করিবেন, এবং আগন্তুকদ্বয়কে অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইবে।

গোলযোগ মিটিয়া গেল, কিন্তু মুখুজ্যে গোষ্ঠীকে দণ্ড দিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইল এই অপমানে বরেন্দ্রনাথ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি বৈঠকখানায় গিয়া নরেনকে ডাকিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন বড় পুকুরের ঘাটে 'চার' করিয়া ভূপেনের সহিত মৎস্য-শিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ললিতাও তাহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিল, এবং সে বঁড়শীতে টোপ গাঁথিয়া দিয়া, কাহার ছিপের ফাৎনা কখন্

নড়িতেছে সে বিষয়ে গল্পনিরত শিকারীদ্বয়কে সতর্ক করিয়া এই শিকার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুকুরপাড়ের কোন্ গাছটা কি জাতীয়, তাহাদের ফুল ও ফলের আকৃতি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয় নরেনের নিকট জানিয়া লইয়া আপনার উদ্ভিদ্-বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া লইতেছিল। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া নরেনকে বড় বাবুর আহ্বান জ্ঞাপন করিল।

তখন একটা বড় মাছ চারের কাছে আসিয়া সাড়া দিতেছিল। নরেন গল্প হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনোযোগটাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং ভৃত্যের আহ্বানে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড়বাবু কেন ডাক্‌চেন ?"

ব্রাহ্মণভোজনের গোলমালের ব্যাপারটা ভৃত্যের অগোচর ছিল না। সুতরাং সে উত্তর করিল, "সে কথা কইতে পাল্লাম না ছোটবাবু, তবে বামুনরা নাকি ঘোঁট ক'রেছে, খেতে আস্‌বে না।"

ফাৎনাটা একটু নড়িয়া উঠিল। তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া নরেন বলিল, "বামুনরা খেতে আসবে না, আমাকে খেতে হবে নাকি ? কেন খেতে আসবে না ?"

ললিতার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভৃত্য বলিল, "তেনারা বলে, ছোট বাবু বাড়ীতে সব খিরিস্তান এনেছে—"

নরেন চমকিত হইয়া ভৃত্যের দিকে রোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই ভৃত্য ভয়ে ভয়ে থামিয়া গেল। ললিতা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ফাৎনা ডুবিয়েছে নরেন বাবু।"

নরেন অন্যমনস্কভাবেই ছিপ ধরিয়া টান মারিল, কিন্তু মাছ গাঁথা পড়িল না। ছিপগাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ক্রুদ্ধভাবে নরেন ভৃত্যকে

ধমক দিয়া বলিল, "আমি এখন যেতে পারব না। এমন সময় বড় বাবু ডাক্‌চেন? বেটা গাধা!"

ভৃত্য কিসে যে আপনার গর্দ্দভত্বের পরিচয় দিল, তাহা বুঝিতে না পারিলেও উদ্যত ছিপগাছটা পাছে তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় সে দ্বিতীয় কথা না বলিয়াই প্রস্থান করিল। নরেন টোপ ঠিক করিয়া দিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি নরেন বাবু? খিরিস্তান সব কে?"

একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "ছেড়ে দিন ওদের কথা, যত সব গণ্ডমূর্খ নিষ্কর্ম্মা লোক, কাজের মধ্যে দলাদলি আর গোঁড়ামি।"

ভূপেন বলিল, "আমাদের বুঝি খৃষ্টান ঠাউরেছে?"

বলিয়া ভূপেন হাসিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "যদিই তা ঠাউরে থাকে, তাতে তা'দের দোষ দেওয়াও যায় না। কেন না আমাদের চাল-চলন বাস্তবিক ওদের মত নয়। পাড়াগাঁয়ে এসে আমাদের এ-রকম মেলা-মেশা প্রকৃতই অন্যায় হ'য়েচে।"

রাগতভাবে নরেন বলিল, "একটুও অন্যায় হয় নি। অন্যায় হ'তো, যদি ঐ সকল গোঁড়াদের মতের কিছুমাত্র মূল্য থাক্‌তো।"

ভূপেন বলিল, "কিন্তু ঐ গোঁড়াদের নিয়েই তো হিন্দুসমাজ, এবং সমাজে ওদের মূল্যহীন মতই প্রবল।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "সম্পূর্ণ দুর্ব্বল। এত দুর্ব্বল যে তা দেখে ভূপিদা তুমি না হেসেই থাক্‌তে পারবে না। ঐ তো কেউ খাবে না বলেছে, কিন্তু দু'টো টাকা পেলেই ছুটে খেতে আস্‌বে। বোধ হয় এতক্ষণ এসেছে।"

ললিতা বলিল, "তাই না কি ?"

নরেন বলিল, "নিশ্চয়। হয় নয়, চল, গিয়ে দেখ্‌বে।"

পুকুরের পাশ দিয়াই রাস্তা। কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাতা মাথায় সেই রাস্তা দিয়া আসিতেছিল। নরেন তাহাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ আমার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উত্তর পাড়ার বামুনরা খেতে আস্‌ছে। বোধ হয় কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য লভ্য হ'য়েছে।"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "কাঞ্চনমূল্য দিলেই বুঝি সব শুদ্ধ ?"

নরেন বলিল, "হাঁ, মায় গরু ছাগল পর্য্যন্ত।"

তিন জনেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাস্যধ্বনিতে চমকিত হইয়া গমনকারী ব্রাহ্মণগণ ঘাটের দিকে, বিশেষতঃ ললিতার উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে বরেন্দ্রনাথ নরেনকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনেছ, আজ সামাজিক দণ্ড দিয়ে ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে হ'য়েছে।"

নরেন উত্তর করিল, "আপনি ব'লে দণ্ড দিয়ে খাইয়েছেন, আমি হ'লে কাণ ধ'রে এনে খাওয়াতাম।"

তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত বুদ্ধি বা সৎসাহস আমার নাই।"

নরেন নত-মস্তকে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি বোধ হয় গরীব বামুনদের কাণ ধ'রে নিজের অনাচারের দোষটা ঢাক্‌তে চাও?"

নরেন বলিল, "আমি এমন কোন অনাচার করি নাই, যাতে সমাজ আমাকে দণ্ডিত কত্তে পারে।"

ক্রুদ্ধস্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হিন্দুর ঘরে ব্রাহ্মদের নিয়ে মেলা-মেশা করা কি অনাচার নয়?"

নরেন বলিল, "ব্রাহ্মদের আমি এতটা অপবিত্র বোধ করি না যে, তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে ধর্ম্মটা লোপ পেয়ে যায়।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি না মনে করলেও সমাজ তা মনে করে।"

নরেন বলিল, "সেটা সমাজের সঙ্কীর্ণতা মাত্র।"

তীব্র শ্লেষপূর্ণ স্বরে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার মত জনকতক উদারনীতিকের আবির্ভাব হ'লেই সমাজ রসাতলে যাবে।"

মুখ তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "যে সমাজে মানুষ মানুষকে এতটা ঘৃণা করে, তার রসাতলে যাওয়াই উচিত।"

বরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি একজন মস্ত সংস্কারক হ'য়ে উঠেছ।"

নরেন বলিল, "এ সমাজের সংস্কার করা বিধাতারও অসাধ্য।"

ভ্রূকুটি সহকারে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু বিধাতার অসাধ্য কাজে হাত দিয়ে তোমরা তো নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে ছাড় না।"

নরেন মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাক্, যা হবার হ'য়েছে, এখন হ'তে একটু সাবধানে চল্‌তে হবে।"

একটু জোর গলায় নরেন বলিল, "সেজন্য বোধ হয় ওঁদের তাড়িয়ে দিয়ে অতিথির অপমান কত্তে ইতস্ততঃ করেন না।"

মুখের উপর এত বড় রূঢ় অভিযোগ শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ রাগিয়া উঠিলেন; তীব্রস্বরে বলিলেন, "যাদের জন্য সম্মান নষ্ট হয়, ভুবন মুখুজ্যের ছেলেকে সামাজিক দণ্ড দিতে হয়, তাদের বাড়ীতে স্থান দেওয়াও উপযুক্ত মনে করি না।"

নরেনও রাগিয়া বলিল, "কিন্তু এ কথাটা চাকর দিয়ে তাঁদের শুনিয়ে দেওয়া ভদ্রতাসঙ্গত কাজ হয় নাই।"

পুনরায় মিথ্যা অভিযোগে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বরেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যচ্যুত ভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার কোন কাজের কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে চাই না।"

নরেন আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই মুহূর্ত্তে ভূপেন ও ললিতাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে অপমানের মাত্রাটা যে আরও বাড়িয়া

যাইবে, এবং তাহার আত্মগৌরবও যে অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়িবে, ইহা বুঝিয়া ক্রোধটাকে সংযত করিয়া লইল এবং ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে যে ঘরে ললিতা ও ভূপেন ছিল, সেই ঘরে উপস্থিত হইল।

ভূপেন তখন ইজি চেয়ারে পড়িয়া একখানা বই পড়িতেছিল, আর ললিতা ভ্রমণের সাজে সজ্জিতা হইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নরেন উপস্থিত হইতেই ললিতা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "বেশ যা হোক্ নরেন বাবু, কখন হ'তে অপেক্ষা কচ্চি, কিন্তু আপনার আর দেখা নাই। আজ না মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার কথা আছে।"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে নরেন বলিল, "দশ মিনিট্ অপেক্ষা করুন, আমি কাপড় ছেড়ে আস্‌চি।"

বলিয়া সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই ভূপেন বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "এটা তোমার নেহাৎ অন্যায় আবদার ললি, নরেনের বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ—"

বাধা দিয়া ললিতা সহাস্যে বলিল, "নরেন বাবুর জন্য সকল কাজই তো আট্‌কে রয়েছে দেখ্‌চি।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে নরেন বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

নরেন নিজের ঘরে গিয়া ব্যস্তভাবে অপর্ণাকে বলিল, "আমার কাপড়-জামাগুলা কোথায় ?"

অপর্ণা বলিল, "পাশের ঘরে আছে।"

নরেন বলিল, "শীগ্‌গীর এনে দাও, আমায় এক্ষুণি বেরুতে হবে।"

অপর্ণা বলিল, "ভোলাকে ডেকে দিচ্চি।"

বিরক্তভাবে নরেন বলিল, "তুমি নিজে এনে দিতে পার না বুঝি ?"

অপর্ণা বলিল, "আমি এখন ছোঁব না।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "কারণ ?"

অপর্ণা বলিল, "কারণ এই মাত্র আমি কাপড়-চোপড় কেচে আস্‌চি।"

ক্রুদ্ধস্বরে নরেন বলিল, "সুতরাং আমার কাপড় ছুঁলে আবার অপবিত্র হ'য়ে যাবে।"

স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া অপর্ণা দরজার নিকট গিয়া ডাকিল, "ভোলা !"

নরেন খাটের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখ, তোমাদের এই শুদ্ধাচারিতা দিন দিন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।"

মৃদু হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "সকলকেই তোমার মত অনাচারী হ'তে বল নাকি ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "হাঁ, বলি।"

মুখখানা ভারী করিয়া অপর্ণা বলিল, "আমার দ্বারা তা হবে না। আমি তোমার ললি নই।"

ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া, মেঝের উপর পা ঠুকিয়া নরেন বলিল, "তুমি তার পায়ের একটা আঙ্গুলেরও যোগ্য নও।"

আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয় ; কারণ আমি পরপুরুষের হাত ধ'রে বেড়াতে পারব না। আমি হিঁদুর মেয়ে।"

তীব্রস্বরে নরেন বলিল, "শুধু হিঁদুর মেয়ে নও, বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে।"

পিতার উদ্দেশে এই শ্লেষোক্তি শুনিয়া অপর্ণা আরও রাগিয়া উঠিল ; বলিল, "আমার বাবা শুধু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ন'ন, তাঁর মত শুদ্ধাচারী এ তল্লাটে নাই।"

শ্লেষের কঠোর হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "সেই জন্যই তোমার মনের ভিতর এত জঘন্য নরক।"

রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া অপর্ণা বলিল, "আর স্বর্গ বুঝি তোমার ললিতার মনের ভিতর ?"

'তোমার' এই কথাটায় নরেন চমকিয়া উঠিল। অপর্ণা কিন্তু তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "ব্রহ্মজ্ঞানী মাগী-টাকে নিয়ে তুমি এতটা ঢলাঢলি ক'চ্চো কেন বল তো ?"

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে নরেন বলিল, "আমি কি করি না করি, তার কৈফিয়ৎ নেবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মেয়েটার মনে যে পবিত্রতা, যে তেজ, তোমার মত বামুন-পণ্ডিতের মেয়ের মনে তা থাকৃতেই পারে না।"

একে পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ, তাহার উপর ললিতার প্রশংসা,—অপর্ণা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিল, "বেশ্যার মনের পবিত্রতা বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে কোথায় পাবে ?"

ক্রোধে নরেনের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইল; সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, "তুমি অতি ইতরের মেয়ে।"

অপর্ণা গ্রীবা উদ্যত করিয়া ক্রোধস্ফুরিত কণ্ঠে বলিল, "ব্রজ শিরোমণির মত সদ্‌ ব্রাহ্মণের মেয়েকে ইতরের মেয়ে বলে, এত সাহস কারো নাই।"

মেঝের উপর জোরে পা ঠুকিয়া সগর্জ্জনে নরেন বলিল, "আমার আছে। শুধু তাই নয়, তোমার মত নীচমনা রমণীকে আমি আমার স্ত্রী ব'লে স্বীকার করি না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "আমিও জোর ক'রে তা স্বীকার করাতে চাই না।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অপর্ণাকে যেন দগ্ধ করিয়া নরেন বলিল, "তা চাইবে কেন? আমি জানি, গরীবের মেয়ের জমিদারের ঘরের সুখ সহ্য হয় না। কূয়োর বেঙ সাগর দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে।"

ভ্রূকুটী করিয়া অপর্ণা বলিল, "আমি কূয়োর বেঙ, আমাকে কূয়োতে থাকতে দাও।"

তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ব'লে রাখচি, তারপর আমার বিনা হুকুমে যদি তুমি এই ঘরের দরজায় পা দাও, তবে তুমি বামুনের মেয়েই নও।"

বলিয়াই নরেন ঝড়ের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অপর্ণা দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া স্তম্ভিত নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহার পর নরেন যে কয়দিন রহিল, ঘরে আসিল না, বাহিরেই কাটাইয়া দিল। তারপর যেদিন প্রতিমা জলে পড়িল, সেদিন ভূপেন ও ললিতাকে লইয়া সে কলিকাতা যাত্রা করিল। সেখানে যাইবার কয়েকদিন পরে শ্বশুরকে পত্র লিখিল, "আপনার কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য তাহাকে ও-বাটী হইতে লইয়া যাইবেন।"

গ্রামের পাশাপাশি সোণারচকে শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর ব্রজনাথ শিরোমণি একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেশবিশ্রুত হইলেও দারিদ্র্য তাঁহার চিরসহচর হইয়াছিল। দারিদ্র্যেরও বিশেষ অপরাধ ছিল না, তিনি নিজেই যেন উহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ন্যায়, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও তিনি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া তৈলবট গ্রহণ করিতেন না, এবং দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিলেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের দান গ্রহণ করিতে যাইতেন না। সুতরাং এদিকের আয় তাঁহার ছিল না বলিলেই হয়। আট দশ বিঘা

ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। সংসারটাও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সংসারে যদিও একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কোন আত্মীয় ছিল না, তথাপি তাঁহাকে অনেকগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হইত। চার পাঁচটী ছাত্র ছিল, বৃদ্ধ ভৃত্য ভজহরি মাইতি ছিল, তাহার তত্ত্বাবধানে একটী গাভী ছিল। তা ছাড়া ঘরে শালগ্রাম শিলা ছিল, অতিথি-অভ্যাগত দুই একজন প্রায়ই থাকিত। সুতরাং গৃহশূন্য হইলেও গৃহস্থালীর কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না। গৃহস্থালীর এই সকল উপকরণ লইয়া শিরোমণি মহাশয় সংসার ত্যাগ করিবার বয়সেও রীতিমত সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

গৃহিণীর মৃত্যুর পর হইতে শিরোমণি মহাশয় নিজেই পাককার্য্য সমাধা করিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে শরীর অপটু হওয়ায় ছাত্রেরা সে ভার লইয়াছিল। তাহারা এক একদিন এক একজনে পালা করিয়া রাঁধিত। শিরোমণি পূর্ব্বাহ্নে কিয়ৎক্ষণ ছাত্রদিগকে পাঠ দিয়া স্নানান্তে পূজায় বসিতেন। পূজাশেষে ছাত্র ও অতিথিদিগের সহিত একত্র আহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সমস্ত অপরাহ্নটা ছাত্রদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় কাটাইয়া দিতেন।

সন্ধ্যার পর গ্রামের অনেক লোকই তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইত। তাহাদের কেহ শাস্ত্রকথা শুনিবার জন্য, কেহ বা বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত। শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিলেও শিরোমণি বিষয়-কার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না; মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি এমনই বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ দিতেন যে, অনেক অভিজ্ঞ প্রবীণ বিষয়ী ব্যক্তিকেও সে উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইত।

ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ধর্ম্ম জিনিষটাকে আচার-ব্যবহারের অনেকটা উপরে আসন দিতেন। তিনি বলিতেন, "যেটা ধর্ম্ম সেটা সার্ব্বজনীন; তার কাছে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান নাই; আর যা দেশভেদে, সমাজভেদে স্বতন্ত্র, সেটা আচার মাত্র, তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং তার ত্রুটীতে ধর্ম্মের লোপ হয় না। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, আর আচার বাহ্য বস্তু, সমাজ-বন্ধনের রজ্জু মাত্র।"

যদি কোন স্পষ্টবাদী শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিত, "আচার যদি বাহ্য জিনিষ, তবে আপনি তাকে মেনে চলেন কেন?"

তাহা হইলে শিরোমণি হাসিয়া উত্তর করিতেন, "আমি সমাজের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আমাকে আচার মেনে চল্‌তেই হবে। যাঁরা এই গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছেন, তাঁদের আর এটাকে মেনে চল্‌বার আবশ্যকতা নাই। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল প্রভেদ নাই, মুসলমানের হাতে খেতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না।" সেই সাধু

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এই উদার মতের জন্য অনেকেই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিত, আবার অনেকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। যাহারা ভক্তি করিত, তাহাদের মধ্যে ভুবন মুখোপাধ্যায় একজন। কার্য্য হইতে অবসর লইয়া ভুবনবাবু যে-কয়দিন নিশ্চিন্তভাবে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি এই উদারমতাবলম্বী পণ্ডিতের সাহচর্য্যে যাপন করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি যে এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে কেবল ধর্ম্মোপদেশই পাইতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে বিষয়-কার্য্য-সম্বন্ধেও পরামর্শ লইয়া বৈষয়িক ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি ইহাঁর নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞও হইয়া ছিলেন। কিন্তু

এই লোভপাশ-নির্ম্মুক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সে কৃতজ্ঞতা-ঋণ বিমুক্ত কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না।

অবশেষে শিরোমণি একমাত্র কন্যা অপর্ণার বিবাহের জন্য যখন পাত্র-অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন ভুবনবাবু কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য অপর্ণাকে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। এটা যে কেবল প্রার্থনা নয়, পরন্তু প্রার্থনার আবরণে ঢাকা একটা বড় দান, ইহা বুঝিয়া শিরোমণি ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "দেখুন ভুবনবাবু, ধনীর ঘরে মেয়ে দিবার শক্তি আমার নাই, আগ্রহও যে আছে এমন কথাও বল্‌তে পারি না। কেন না আমার বিশ্বাস, গরীবের মেয়ে ধনীর ঘরে গিয়ে প্রায় সুখী হয় না, তার জন্মগত দোষটা তাকে ধনীদের কাছ হ'তে দূরে ঠেলে রাখে। কিন্তু এ বিশ্বাস সত্ত্বেও আমি আপনার সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধের লোভ সংবরণ কত্তে পারলাম না।"

নরেনের সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জামাতা পাইয়া শিরোমণি হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু কর্ম্মফল অখণ্ডনীয় ভাবিয়া শেষে বিধাতার উপর এই চিন্তাভার অর্পণপূর্ব্বক শাস্ত্রচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

তারপর ভুবনবাবুর মৃত্যু হইল; অপর্ণা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বামিগৃহে স্থায়ী বাস আরম্ভ করিল। শিরোমণি তাহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এই মায়াময় অখিল পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে আশু ব্রহ্মপদে আত্ম-সমর্পণ করিবেন তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা একদিন নরেনের পত্র আসিয়া যেন তীব্র শেলের আঘাতে তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় চিন্তাটাকে সজাগ করিয়া দিল।

ধর্মে

শিরোমণি পত্রখানা লইয়া বরেন্দ্র বাবুকে দেখাইলেন। বরেন্দ্রনাথ ইহাতে নিজের সম্মতি অসম্মতি কিছুই না জানাইয়া শুধু বলিলেন, "সে আপনার ইচ্ছা।"

শিরোমণি তখন কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর্ণা যাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। অগত্যা তিনি কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপর্ণার পিত্রালয়ে গমন-সম্বন্ধে বরেন্দ্রনাথ কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিলেও ইহার ফল-স্বরূপ যে ক্রোধ তাহা অন্তরে পোষণ করিতে ছাড়িলেন না। এই ক্রোধের মূলে ছিল অভিমান। নরেন তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই নিজের স্ত্রার সম্মান রক্ষার জন্য তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল, এবং এই সাহসিক কার্য্য দ্বারা সে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এই বাড়ীর একজন স্বতন্ত্র মালিক ইহাই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়া পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইল। শুধু তাহাই নহে, লোকের কাছেও সে জ্যেষ্ঠকে যেন অনেকখানি ছোট করিয়া ফেলিল। সুতরাং বরেন্দ্রনাথ ইহাতে না রাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। তবে সে ক্রোধটা নিজের অন্তরের মধ্যেই এমনভাবে চাপিয়া রাখিলেন যে, মহামায়া পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব অবগত হইল না। অপর্ণা চলিয়া গেলে সে যখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বৌ হঠাৎ বাপের বাড়ী গেল যে?"

বরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "বড় লোকের বাড়ী বিয়ে হ'য়েছে ব'লে কি বাপের বাড়ীটা ভুলে যেতে হবে?"

মহামায়া শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল; কেন না এই বড়লোকের বাড়ীতে বিবাহিত হওয়ার অপরাধেই তাহাকে পিত্রালয়টা বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল।

এইরূপে অন্তরের ক্রোধ-বহ্নিটাকে অন্তরেই চাপিয়া রাখিলেও হঠাৎ একদিন তাহা এমনই অতর্কিতভাবে বিদীর্ণ আগ্নেয়গিরির ন্যায় আত্ম-

প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, তাহাতে বরেন্দ্রনাথ নিজেও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

মোড়ল পাড়ার নিতাই সরকারের খাজনা বাকী পড়ায় তাহার নামে বাকী-খাজনার নালিশ হইয়াছিল। নিতাই আসিয়া বড়বাবুর নিকট অনেক কাঁদা-কাটা করিল, কিন্তু বড়বাবু তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। নায়েব গোপীনাথ সমাদ্দার বড়বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, নিতাই সরকারের ন্যায় দুষ্ট প্রজা মহালে আর একটী নাই; ক্ষমতা সত্বেও সে দুষ্টামী করিয়া খাজনা বাকী ফেলিয়াছে, এবং নিজে খাজনা না দিয়াই সন্তুষ্ট নহে, আর সকল প্রজাকেও বিগড়াইবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং তাহাকে শাসন না করিলে এক পয়সা খাজনা আদায় হইবে না।

নায়েবের কথায় বড়বাবু নিতায়ের উপর চটিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার মায়া কান্নায় ভুলিলেন না। মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া গেল, এবং আদালতের পেয়াদা আসিয়া নিতায়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর ক্রোক দিল।

নরেন এই সময় গরমের ছুটীতে দেশে আসিয়াছিল। বড়বাবুর নিকট হতাশ্বাস হইয়া নিতাই একদিন সুযোগমত ছোটবাবুকে ধরিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিল যে, নায়েব সমাদ্দার মহাশয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশনে টাকা প্রতি চারি আনা মাথট দিতে অস্বীকৃত হওয়াতেই তাহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এ জন্য সে ৭ সালে খাজানা পূরাপূরি দিয়াও 'কবচ' পায় নাই, তাহার পর বৎসর অজন্মাবশতঃ অর্দ্ধেক খাজনা মাত্র দিয়াছে, কিন্তু তাহাও রেহাই পাইতেছে না।

নায়েব গোমস্তারা যে প্রজার উপর অত্যাচার করে ইহা নরেনের অবিদিত ছিল না, সুতরাং সে নিতাইকে আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। তারপর সে জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া নিতাই সরকারের দুর্দ্দশা ও নায়েবের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ রুষ্টভাবে বলিলেন, "দুষ্ট প্রজারা চিরকালই নায়েব গোমস্তার উপর দোষ চাপিয়ে নিজেরা সাঁচ্চা হবার চেষ্টা করে।"

নরেন বলিল, "কিন্তু এক্ষেত্রে কে দোষী, কে সাঁচ্চা তার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

বিরক্তভাবে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য খাজনা আদায়। সে খাজনা দিয়ে থাকে, আদালতে গিয়ে সেটা প্রমাণ কত্তে পারলেই রেহাই পেতে পারে।"

নরেন বলিল, "সে গরীব, প্রমাণ করাবার শক্তি তার নাই।"

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিনা প্রমাণে আমারও খাজনা ছাড়বার শক্তি নাই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরেন বলিল, "কিন্তু এটা কি নেহাৎ অন্যায় নয়?"

রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ন্যায়-অন্যায় বোধ তোমার চেয়ে আমার বেশী আছে বোধ হয়।"

ইহার উপর আর কোন কথা বলা নরেন যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না, সে ক্ষুব্ধভাবে জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে ফিরিল।

অতঃপর নরেন একদিন গোপীনাথের নিকট শ্রুত হইল যে, নিতাই সরকারের নামে ডিক্রীজারি করিয়া নীলাম-ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে। গোপীনাথ শুধু এই পর্য্যন্ত শুনাইয়াই নিরস্ত হইল না,

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দুঃখ-সহকারে প্রকাশ করিল, এত শীঘ্র নীলাম-ইস্তাহার জারি করিবার কোনই কারণ ছিল না। শুধু ছোট বাবু নিতায়ের পক্ষ অবলম্বন করাতেই বড় বাবু রাগে শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে জাহান্নমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিয়া নরেন বিস্ময়ের সহিত বলিল, "কেন, তার পক্ষে আমি কি এমন অন্যায় কথা ব'লেছি?"

গোপীনাথ মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "একটুও অন্যায় নয়, বরং আপনি ন্যায্য কথাই বলেছিলেন। এই ধরুন, সে খাজনা দিয়েছে কি না তার একটা তদন্ত হ'লে আমার দুর্ণামটাও তো খণ্ডন হ'তো। কিন্তু ঐ যে আপনি বলেছেন কি না, তাই রাগে এমন দরকারী কথাটাতেও কাণ দিলেন না।"

নরেন ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "এত রাগই বা কিসের? উনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, তাতে আমার একটা কথা বল্‌বারও কি অধিকার নাই?"

গোপীনাথ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "অধিকার নাই? অধিকার দস্তুরমত আছে। আপনি হলেন অর্দ্ধেক বিষয়ের মালিক।"

নরেন গম্ভীরভাবে রহিল। গোপীনাথ বলিল, "মনিব, কি আর বলবো বলুন ছোটবাবু, তা নইলে আপনি যখন অনুরোধ ক'রে-ছিলেন, তখন যতই দোষী হোক্, তাকে মাপ করাই বড় বাবুর উচিত ছিল। আপনাকে এমনভাবে অপমান করাটা কি ভাল হ'য়েছে?"

গর্জ্জন করিয়া নরেন বলিল, "অপমান! আমি দেখে নেব, কে নিতাই সরকারের ঘর ভিটে নীলাম করে।"

আহ্লাদের হাসি হাসিয়া হর্ষপ্রফুল্লকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "সিংহের বাচ্চা কি না।"

এই প্রশংসায় কিছুমাত্র উৎফুল্ল না হইয়া নরেন সোজা খাজাঞ্চির কাছে গেল, এবং নিজের নামে খরচ লিখিয়া আড়াই শত টাকা দিতে বলিল। খাজাঞ্চি কিন্তু বড় বাবুর বিনা হুকুমে এত টাকা দিতে পারিল না, সে হুকুম আনিবার জন্য বড় বাবুর কাছে গেল। তাহার পূর্ব্বেই গোপীনাথ বড় বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "ছোট বাবু যখন এতই জেদ ধরেচেন, তখন নিতাই সরকারের মামলাটা ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।"

তর্জ্জন করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছোট বাবুর ভয়ে নাকি?"

গোপীনাথ শঙ্কিতভাবে বলিল, "ভয়ে না হ'লেও তিনি যখন জেদ ধরেচেন, তখন বোধ হয় নিজ থেকে টাকা দিয়েও নীলাম রদ করবেন।"

আসনের উপর সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নীলাম যদি রদ হয়, তা হ'লে তোমারও চাকরীর খতম তা জেনে রাখবে।"

গোপীনাথ ভয়ে ভয়ে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে খাজাঞ্চি আসিয়া ছোট বাবুর প্রয়োজন জানাইয়া টাকা দিবার হুকুম চাহিল। বরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, নিতাই সরকারের জন্যই নরেনের টাকার প্রয়োজন। তিনি টাকা দিতে নিষেধ করিলেন। খাজাঞ্চি ফিরিয়া গিয়া নরেনকে বড় বাবুর আদেশ জানাইল। নরেন রাগে ফুলিতে ফুলিতে একেবারে বড় বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, এবং কষ্টে ক্রোধটা চাপিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "খাজাঞ্চিকে আড়াইশো টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করলে।"

বরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তার দোষ নাই।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "তবে দোষটা কার ?"

তাহার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দোষ তোমার। তোমাকে যে টাকা দেওয়া হয়, তা তোমার ন্যায্য খরচের অতিরিক্ত।"

ক্রোধকম্পিত স্বরে নরেন বলিল, "সেটা কি আমাকে কেউ দয়া ক'রে দেন ?"

তীব্রকণ্ঠে বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি যেরূপ মনে কর।"

নরেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "আমি কারো দয়া চাই না। আমার সম্পত্তি ভাগ ক'রে দিন।"

বরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধ-তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "উত্তম, কিন্তু এটা শাক মাছের ভাগ নয় যে, একদিনে ভাগ হ'তে পারে।"

"হয় কি না দেখে নেব" বলিয়া নরেন অস্থিরপদে কক্ষ ত্যাগ করিল। বরেন্দ্রনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "নরেন যদি চায়, তাকে টাকাটা দিও।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নরেন কিন্তু টাকা চাহিল না, তাহার পরিবর্ত্তে সে উকীল মোক্তার-দিগের নিকট পরামর্শ চাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরামর্শের অভাব হইল না, গ্রামের অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নরেনকে এত সৎপরামর্শ দিতে লাগিল যে, ইহার পূর্ব্বে নরেন বুঝিতে পারে নাই, গ্রামে তাহার এত হিতৈষী লোক আছে। হিতৈষী কেবল নরেনেরই ছিল না, বড় বাবুরও অনেক হিতৈষী ছিল, এবং তাহারা বড় বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া নরেনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশপূর্ব্বক এমনই ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাহাতে তাহাদের গভীর দুঃখের মধ্য দিয়াও আন্তরিক আনন্দ ও কৌতূহলের আবেগটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। সুতরাং এই হিতৈষিদলের সমবেদনায় বড় বাবু কিছুমাত্র প্রীত হইতে পারিলেন না, বরং তরুণ-প্রকৃতি কনিষ্ঠের সহিত কঠোর ব্যবহার করিয়া যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন ইহাই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু হাতের শর আর মুখের কথা একবার ছাড়িয়া দিলে আর উপায় থাকে না। অগত্যা বরেন্দ্রনাথকে আপনার আকস্মিক ক্রোধ-জনিত অনুতাপটা নীরবেই ভোগ করিতে হইল।

এদিকে নরেন মহোৎসাহে বণ্টননামার মোকদ্দমার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। মোকদ্দমা করিতে হইলে টাকার দরকার; নরেনের হাতে কিন্তু টাকা ছিল না। হাতে টাকা না থাকিলেও টাকার অভাব হইল না। জানকী ঘোষালের চেষ্টায় রাইপুরের জমিদার ত্রিলোচন

সিংহ নরেনের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তিনি বরেন্দ্রনাথের অন্যায় আচরণ শুনিয়া নরেনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রতীকার জন্য তিনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। শুনিয়া নরেন আশ্বস্ত হইল।

চিরশত্রু ত্রিলোচন সিংহ নরেনের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে শুনিয়া বরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হইলেন; তিনি লোক লাগাইয়া নরেন্দ্রনাথকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার নিযুক্ত লোকেরা নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতে গিয়া নরেনের হৃদয়ে এমনই উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়া দিতে লাগিল যে, তাহাতে নরেনের শান্ত হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কনিষ্ঠের পরিণাম চিন্তা করিয়া বরেন্দ্রনাথ বিমর্ষ হইলেন। জ্যেষ্ঠের বিমর্ষভাব দেখিয়াও নরেন কিন্তু দমিল না, তৎকৃত কঠোর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইল।

সেদিন নরেন সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে বসিয়া মোকদ্দমাসংক্রান্ত কতকগুলা কাগজ দেখিতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে মহামায়া ডাকিল, "ঠাকুরপো।"

চমকিত হইয়া নরেন ফিরিয়া চাহিল। মহামায়া খুব কাছে আসিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ওগুলা কি? মোকদ্দমার কাগজ বুঝি?"

নরেন চুপ করিয়া রহিল। মহামায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আর কাজ নাই তো, ভায়ে ভায়ে মোকদ্দমা বাধিয়ে মস্ত একটা কাজ নিয়ে বসেছ।"

নরেন মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া নিরুত্তরে রহিল। মহামায়া বলিল, "তোমার আর কষ্ট ক'রে ওগুলো দেখবার দরকার নাই।"

মুখ ফিরাইয়া নরেন গম্ভীরভাবেই সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হুঁ।"

মহামায়া বলিল, "হুঁ নয় ঠাকুরপো, তুমি কি মনে করেছ, ইচ্ছা করলেই ঠাকুরের এত কষ্টের বিষয়টা উড়িয়ে দেবে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরেন বলিল. "সে ইচ্ছা আমার একটুও নাই।"

মহামায়া বলিল, "তোমার না থাক্‌লেও পাঁচজনের সে ইচ্ছা খুব আছে।"

উত্তরে নরেন একটা তীব্র ভ্রূকুটী করিল মাত্র। মহামায়া সহাস্তে বলিল, "কিন্তু পাঁচ জনের সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না ঠাকুরপো।"

তাচ্ছীল্যের সহিত নরেন উত্তর করিল, "দেখা যাবে।"

সহসা মহামায়ার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল; সে মুখখানাকে ক্রোধ-গম্ভীর করিয়া বলিল, "কি দেখ্‌বে তুমি? ভায়ে ভায়ে মোকদ্দমা ক'রে জমিদারী ভাগ ক'রে নেবে? সেদিনকার ছেলে তুমি, আমি এসে তোমাকে নেংটো দেখেছি, সেই তোমার এত স্পর্দ্ধা? বড় ভায়ের অপমান করবে, ভাই ভাই আলাদা হবে, মোকদ্দমা ক'রে বিষয় ওড়াবে, আমাকে এই রকম তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করবে, কেন, তুমি কি মনে করেছ বল তো?"

নরেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এ কি, এ যে সেই আট দশ বছর আগেকার বৌদি, যে বৌদি একটু অন্যায় দেখলেই কাণ ধরিয়া শাসন করিত, যাহার কঠোর আহ্বান শুনিলে নরেনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, আবার ক্ষণ পরেই যাহার আদরে সে গলিয়া যাইত। আজ এত দিন পরে মহামায়ার সে মূর্ত্তি দেখিয়া নরেন শিহরিয়া উঠিল।

মহামায়া তাহার মুখের উপর ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অধিকতর তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি ভেবেছ তুমি? মাথার উপর শাসনকর্ত্তা নাই ব'লে তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে? এখন তোমার কাণ ধ'রে শাসন

করবার বয়স নাই ব'লে কি মনে করেছ, আমার সাক্ষাতে তুমি এই অন্যায় অত্যাচারগুলা স্বচ্ছন্দে ক'রে যাবে।"

নরেনের মাথাটা ক্রমেই নীচু হইয়া পড়িতে লাগিল। মহামায়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শোন ঠাকুরপো, বিষয় নিয়ে মামলা মোকদ্দমা চল্‌বে না, জমিদারীর ভাগও হবে না। আমরা এবাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্চি। ভাগাভাগির আর দরকার নাই।"

সবিস্ময়ে নরেন বলিয়া উঠিল, "চলে যাচ্চো ?"

মহামায়া সহাস্যে বলিল, "সেটা এতই অসম্ভব নাকি ? ভায়ে ভায়ে ভাগাভাগির চেয়ে এটা আদৌ অসম্ভব নয়। আর তোমার কাছে অসম্ভব মনে হ'লেও তোমার দাদার কাছে ঠিক তা নয়। বিষয়ের উপর যখন তোমার এতটা মমতা, তখন তুমি বিষয় নিয়ে থাক, আমরা এখান হ'তে সরে যাই। শুধু যাচ্চি না, তোমার দাদা তোমার নামে সমস্ত বিষয় লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাবেন। তুমি শুধু মাস মাস আমাদের পঞ্চাশটা ক'রে টাকা দিও। কেমন, এতে তোমার মত আছে ?"

নরেন কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিল না; মতামত প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও তাহার তখন ছিল না; মহামায়ার অসম্ভব প্রস্তাবটা তাহার বুকের ভিতর একটা নূতন চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছিল। সে নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। মহামায়া বলিল, "মত তোমায় কত্তেই হবে ঠাকুরপো, তোমার দাদার প্রতিজ্ঞা, প্রাণ থাক্‌তে জমিদারী ভাগ হ'তে দেবেন না। কাজেই এ ছাড়া এখন আর উপায় নাই। দু'চার দিনের মধ্যেই লেখাপড়া শেষ ক'রে দিয়ে তিনি বাড়ী ছেড়ে যাবেন।

কল্‌কাতায় একটা ছোট-খাটো বাড়ী ভাড়ার জন্য তিনি এক বন্ধুকে লিখে দিয়েছেন।”

বলিয়া মহামায়া হাত বাড়াইয়া নরেনের সম্মুখস্থিত কাগজগুলা লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। তারপর নরেনের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই ধীর গম্ভীর পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বৌদির শাসনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া নরেন স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই নরেন কলিকাতা যাত্রা করিল। যাইবার সময় মহামায়াকে বলিয়া গেল, “কল্‌কাতা হ’তে ফিরে এসে তোমার কথার উত্তর দেব, বৌদি।”

নরেন কিন্তু নিজে উত্তর দিতে আসিল না; দিন দুই পরে বরেন্দ্রনাথের নামে একখানা পত্র আসিল। পত্রে নরেন জ্যেষ্ঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছে, “আমার জন্য আপনাদের দেশত্যাগী হ’তে হবে না, আমিই দেশত্যাগ করলাম। বিষয়ের ভাগ নেবার জন্য আর কোনদিন আপনার কাছে যাব না একথা আমি শপথ ক’রে বল্‌ছি। অবাধ্য কনিষ্ঠকে মার্জ্জনা করবেন।”

ইহার পর প্রায় দুই বৎসর নরেন দেশে আসিল না। পর বৎসর জমিদার-বাড়ীতে পুনরায় বাসন্তী পূজা হইল, কিন্তু পূজার সময় গরীব দুঃখীরা ছোটবাবুকে দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইল। সে বৎসর পূজার তিন দিন সন্ধ্যার পর পূজাবাড়ীতে কন্‌সার্ট বাজিল না, যাত্রার আসর তেমন মনোমত সাজান হইল না। বরেন্দ্রনাথের মনটাও খুব ভার হইয়া রহিল। কেহ ছোটবাবুর না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিরক্তির সহিত উত্তর দিতেন, “জানি না।”

আশ্বিনমাসে পূজার ছুটীর সময় মহামায়া স্বামীকে জেদ করিয়া

বলিল, "ছেলে মানুষ রাগ ক'রে গিয়েছে ব'লে কি তাকে আনতে হবে না? যেমন ক'রে হোক তাকে এই ছুটীতে নিয়ে এস।"

বরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ছেলে মানুষ হ'লে জোর ক'রে নিয়ে আসতাম। বুড়ো হ'লে নিজেই বুঝে আসতো। কিন্তু সে দু'য়ের বা'র।"

মহামায়া বলিল, "তা আমি জানি না; তোমরা না পার, আমি নিজে তাকে আনতে যাব।"

অগত্যা বরেন্দ্রনাথ ভ্রাতাকে আনিবার জন্য গোমস্তা শিবু সরকারকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনদিন পরে শিবু ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ছোটবাবু কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছেন। শুনিয়া মহামায়াকে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু সে স্বামীকে ধরিয়া বসিল, "চল না, আমরাও দিনকতক পশ্চিমে ঘুরে আসি। তোমারও তো শরীর খারাপ, ডাক্তার কতবার পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে বলছে।"

ঈষৎ হাসিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুধু ডাক্তারে কেন, তুমিও তো বলচো, কিন্তু আমি যে যেতে পাচ্চি না।"

মহামায়া জোর করিয়া বলিলেন, "এবার কিন্তু তোমায় যেতেই হবে। বিষয় আগে, না শরীর আগে।"

শরীরকে উপেক্ষা করিলেও বরেন্দ্রনাথ পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে পশ্চিমযাত্রার আয়োজন করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "এবারকার পূজার ছুটীটা কোথায় কাটাবেন নরেনবাবু ?"

নরেন বলিল, "যেখানে হোক, এক জায়গায় কেটেই যাবে।"

ললিতা বলিল, "তবু একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করা তো দরকার।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "কিছুমাত্র না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া ভূপেন বলিল, "হৃষীকেশের হাতে যদি চাবুক থাক্‌তো, তা হ'লে চাবুকের চোটে তিনি ভটচাজ্জি মশায়কে বর্দ্ধমান জেলার দিকে রওনা হ'তে বাধ্য কত্তেন।"

নরেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "চাবুক বেশ ভাল রকমই আছে ভূপিদা। আর সেই চাবুকের চোটেই ও-দিক্‌টা পর্য্যন্ত ত্যাগ কত্তে হ'য়েছে।"

ভূপেন বলিল, "সেটা চাবুকের গুণে নয়, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার গুণে।"

মাথা নাড়িয়া নরেন বলিল, "ঐটাই যে মস্ত চাবুক ভূপিদা, তা নইলে নরেন্দ্রনাথের মত বুদ্ধিমান্ ছোক্‌রার ঘাড়ে এমন খেয়ালটা চেপে বস্‌বে কেন। অনুকূলদা বলে—এসব কর্ম্মফল; জীবমাত্রেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ।"

ললিতা সহাস্যে বলিল, "আর সেই সূতার খেইটা আছে বুঝি হৃষীকেশের হাতে ?"

নরেন বলিল, "নিশ্চয়। তিনি যখন যেদিকে টান দিচ্চেন সেই দিকেই ছুট্‌তে হচ্চে।"

ভূপেন বলিল, "সৌভাগ্যের বিষয়, সূতাটা এমনই শক্ত যে, এত টানাটানিতেও তা ছেঁড়ে না।"

নরেন গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ছিঁড়বার যো কি। একি তোমার ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের নম্বরী সূতা যে একটু টান সইবে না। এ মানব-জ্ঞানাতীত অদৃশ্য কলে অদৃশ্য হস্তে প্রস্তুত কর্ম্মসূত্র। সারা জগৎটা এই অদৃশ্য সূতায় বাঁধা।"

ললিতা বলিল, "চমৎকার সূতা বটে। আচ্ছা, মনে করুন নরেন বাবু, আপনি ঠিক ক'রে আছেন, ছুটীর দিন কয়টা মেসের অন্নধ্বংস ক'রেই কাটিয়ে দেবেন, কিন্তু হঠাৎ সূতায় টান পড়লো আগ্রা হ'তে।"

নরেন বলিল, "তৎক্ষণাৎ ই আই রেলের টাইম-টেবল নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে।"

ললিতা হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "বেশ কথা, তা হ'লে ঠিক রইল, রবিবার সন্ধ্যার পুরী এক্সপ্রেসে সূতাটা আপনাকে পুরীর দিকে টেনে নিয়ে যাবে।"

নরেনও হাসিয়া উত্তর করিল, "উত্তম, আমিও বিনা আপত্তিতে সুবোধ বালকের মত এক্সপ্রেসে গিয়ে উঠ্‌বো।"

ভূপেন মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "তুইও যেমন ললি, ও আবার যাবে না? দেশ ভ্রমণ, আর সেই সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন! কি হে, রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা—"

নরেন হাসিয়া বলিল, "আশ্বিন মাসে তুমি আবার রথ কোথায়

পেলে ভূপিদা? তা পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন না হোক, ছুটীর অলস দিনগুলার নিরানন্দটা খণ্ডে যাবে তো? সেটাও খুব কম লাভ নয়।"

বলিয়া নরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া হার্শ্মোনিয়মের কাছে গিয়া বসিল, এবং হার্শ্মোনিয়ম খুলিয়া গান ধরিল,—

"আমার খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে,
তবু তো এ ছার খাটা না ফুরায়;
আমায় লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার—"

চম্পটী সাহেব ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "গুড্ ইভ্নিং।"

ভূপেন তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খবর কি মিঃ চম্পটী?"

চম্পটী সাহেব রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সংবাদ শুভ। অনেক কষ্টে সেকেণ্ড ক্লাসের একটা কামরা রিজার্ভ পাওয়া গিয়েছে।"

ভূপেন বলিল. "রিজার্ভ না হ'লেও বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।"

তিরস্কারের স্বরে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "ক্ষতি ছিল না? তুমি বল কি হে ভূপেন? তুমি কি ধারণা কত্তে পাচ্চো কি রকম ভিড় হবে? সেই ভিড়ে ললিতাকে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?"

ভূপেন বলিল, "এক্সপ্রেসে ভিড় হয়, প্যাসেঞ্জারে গেলেও চল্‌তো।"

তাহার মুখের উপর যেন রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "প্যাসেঞ্জারে? এ্যাবাউট টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স? এই ক'টা টাকার মমতায় কষ্টের ভাগ কতটা বেশী হবে বল দেখি।"

এ কথাটা ভূপেন অস্বীকার করিতে পারিল না; সুতরাং চম্পটী সাহেবের কাজটাকে ভাল বলিয়াই অনুমোদন করিতে হইল। ললিতা বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে আমরা আর একজন সঙ্গী পেয়েছি

মিঃ চম্পটী, নরেন বাবু অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গী হ'তে রাজি হ'য়েছেন।"

চম্পটী সাহেবের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্তিতে যেন বিকৃত হইয়া আসিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ম্লান হাস্যের সহিত বলিলেন, "এজন্য আমি নরেনবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কচ্চি।"

কিন্তু তাঁহার এই ধন্যবাদের ভিতর দিয়া আন্তরিক আনন্দ যে একটুও ফুটিয়া উঠিল না, তাহা নরেন ও ললিতার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। একটু থামিয়া চম্পটী সাহেব সহসা যেন উদ্বুদ্ধভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু একটা বিষয়ে বড়ই গোলযোগ বাধ্‌চে, মাত্র তিন জনের জন্যই গাড়ী রিজার্ভ হ'য়েছে।"

ললিতা বলিল, "তিনকে চার করা খুব কঠিন কাজ নয়।"

জুতার আগাটা মেজের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খুব সোজাও নয়। তা হ'লে আবার গিয়ে নূতন—"

নরেন ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, তাতে আর কাজ নাই। আমি স্বতন্ত্র গাড়ীতেই যেতে পারবো।"

চিন্তিতভাবে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু সেটা—অথচ গাড়ীর যে রকম অভাব, তাতে দ্বিতীয় বন্দোবস্ত হবে কি না—"

ললিত বলিল, "তা হ'লে এক কাজ করা যাক, গাড়ী রিজার্ভ ক'রবার দরকার নাই। অমনিই সকলে এক গাড়ীতে যাওয়া যাবে।"

বিমর্ষমুখে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "সেটা সম্ভব হ'তে পারতো যদি এটা পূজার ছুটী না হ'য়ে অন্য সময় হ'তো। এ সময়ে, সকলে কি বল্‌ছেন, বিনা রিজার্ভে এক জনে একখানা গাড়ীতে স্থান পেলে হয়।"

ললিতা বলিল, "তা হ'লে নরেন বাবুই বা স্বতন্ত্র গাড়ীতে যাবেন কি ক'রে ?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "সে জন্য আপনার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি সেকেণ্ড ক্লাসে না হয় ইণ্টার ক্লাসে, তাও না হয়, অন্ততঃ থার্ড ক্লাসেও একটু জায়গা ক'রে নিতে পারবো।"

ললিতা মুখ ঘুরাইয়া আবদারের সুরে বলিল, "না না, তাও কি হয় ? তা হ'লে রাস্তার আমোদটা যে সব মাটী হবে।"

তখন ভূপেন তাহাকে বুঝাইয়া দিল, এসময়ে গাড়ীতে যেরূপ স্থানাভাব, তাহাতে পুনরায় রিজার্ভের বন্দোবস্ত করিতে গেলে গাড়ী পাওয়া যাইবে কি না তাহা সন্দেহের স্থল, এবং না পাওয়া গেলে পূরা আমোদটাই মাটী হইবে। এ-ক্ষেত্রে 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' এই প্রাচীন নীতির অনুসরণে পথের আমোদটা বাদ দিলেও যদি অবশিষ্ট আমোদটা বজায় থাকে তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত। আর নরেনকে সারা পথ যে একাই যাইতে হবে এমন কোন কথা নাই, সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতে পারিবে।

অগত্যা ললিতাকে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল, এবং নরেনকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া দিল। নরেন তাহাতে স্বীকৃতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সে চলিয়া গেলে ভূপেনের সহিত চম্পটী সাহেবের যাত্রা-সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তুমি ইংরাজের দোকান হ'তে একটা সুট্ আনিয়ে নাও ভূপেন। অনেকে আজকাল সাহেবী ড্রেসের নিন্দা করে, কিন্তু তারা জানে না, পথে-ঘাটে এটা কত উপকারে আসে।"

তখন দেখ্‌বে, তোমার ধুতি-চাদরের চেয়ে এতে কত সুবিধা, কত সম্মান পাওয়া যায়। হ্যাট্-কোট্ দেখ্‌লে পুলিশ পর্য্যন্ত পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।"

চম্পটী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন, ভূপেনও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অতঃপর চম্পটী সাহেব প্রস্থানোদ্যত হইলে ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোন্ দিকে যাবে ?"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "চৌরঙ্গীর দিকে। কতকগুলো জিনিষ কেন্‌বার দরকার আছে।"

ভূপেন বলিল, "আমাকেও একবার চাঁদনীর দিকে যেতে হবে। বাইরে তোমার গাড়ী আছে তো ?"

চম্পটী বলিলেন, "হাঁ, মোটর আছে।"

ভূপেন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেল। ললিতা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আমি চেষ্টা করবো, যাতে চার জনের মত গাড়ী রিজার্ভ কত্তে পারি।"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আপনাকে আর কষ্ট কত্তে হবে না, তিনি আলাদা গাড়ীতেই যাবেন।"

বলিয়াই সে পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। চম্পটী সাহেব চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ভূপেন কাপড় ছাড়িয়া আসিলে টুপীটা তুলিয়া লইয়া ধীর-গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুরী এক্সপ্রেস খানা পুরীগামী যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া খড়গপুর ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইতেই ভূপেন নামিয়া অদূরবর্ত্তী ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ললিতা জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া আলোক-সমুজ্জ্বল ষ্টেশনের জনতার দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চম্পটী সাহেব এতক্ষণ বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, এক্ষণে সজাগ হইয়া ললিতার দিকে একটু সরিয়া আসিলেন, এবং এটা কোন্ ষ্টেশন, এখান হইতে কোন্ দিকে কোন্ লাইন বাহির হইয়াছে, কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব কত, টাইমটেবল্ খুলিয়া ললিতাকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ললিতা বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহার কথায় সায় দিতে থাকিল।

সহসা মিলিটারী পোষাক পরা এক ইংরাজ আসিয়া দরজার হাতল ধরিল, এবং চম্পটী সাহেবের মুখ হইতে নিষেধ-বাক্য উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিয়া সম্মুখের বেঞ্চিখানা অধিকার করিল। তাহার আগমনে ললিতা যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। চম্পটী সাহেব ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় আগন্তুক ইংরাজের দীর্ঘ গুম্ফ-শোভিত কঠোর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু সোজা হইয়া বসিয়া ধীর-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গাড়ীতে প্রবেশ করবার আগে তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, রিজার্ভ গাড়ীতে অন্যের প্রবেশাধিকার নাই।"

ইংরাজ সদম্ভে উত্তর করিল, "গাড়ীতে যখন যথেষ্ট স্থান আছে, তখন সে বিবেচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করি না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু এখনি ষ্টেশন-মাষ্টার এসে তোমাকে সে-সম্বন্ধে বিবেচনা কত্তে বাধ্য করবেন।"

জিহ্বা ও তালু-সংযোগে একটা অবজ্ঞাসূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া ইংরাজ বলিল, "ষ্টেশন-মাষ্টার তোমার মত অর্ব্বাচীন নয়।"

রাগে চম্পটী সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই অসভ্য লোকটাকে গলাধাক্কা দিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেন; কিন্তু লোকটার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ তাঁহাকে সে-ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে এগাড়ী হ'তে চলে যাও।"

তাঁহার সে গর্জ্জনে আগন্তুক কিন্তু কিছুমাত্র ভীত হইল না। সে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "ইয়ংম্যান, আশা করি, বৃথা চীৎকার ক'রে তুমি তোমার এই সুন্দরী সঙ্গিনীর নিকট নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না।"

বলিয়া ইংরাজ বেশ জাঁকিয়া বসিয়া ললিতার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চম্পটী সাহেব ক্রোধে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিলেন। একবার ভাবিলেন, নামিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে যাই। কিন্তু ললিতাকে একা ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। ললিতাকে সঙ্গে লইয়াও নামিয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; কেননা গাড়ীতে জিনিষপত্র সব রহিয়াছে। অগত্যা তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে উঠিয়া দরজার নিকট গেলেন, এবং দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিলেন, "পোলিস্!"

ইংরাজ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে বিকট হাস্যধ্বনিতে ভীত হইয়া ললিতা অস্ফুট চীৎকার করিল। কিন্তু ইংরাজ তাহাতে

ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে চম্পটী সাহেবের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিতে টানিতে বলিল, "তুমি একটী আস্ত নির্ব্বোধ। যাও, নিজের স্থানে গিয়ে চুপ ক'রে বসো।"

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চম্পটী সাহেব অপর হাতে ঘুঁসী তুলিলেন। কিন্তু তাহা ইংরাজের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে সেই হাতটাও চাপিয়া ধরিল। চম্পটী সাহেব ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি, তুমি একজন ভদ্রলোকের গাত্র স্পর্শ কর? জান, আমি তোমার নামে ডিফামেশন সুট্‌ আন্‌তে পারি।"

ইংরাজ হাসিয়া বলিল, "দুঃখের বিষয়, এটা কোর্ট নয়—রেলগাড়ী, এবং এখানে এই সুন্দরী ছাড়া অন্য বিচারক নাই।"

বলিয়া সে ললিতার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চম্পটী সাহেব প্রাণপণে আপনার হাত টানিলেন, সে টানে ইংরাজের শিথিল মুষ্টিবন্ধ হইতে তাঁহার হাত দুইটা মুক্ত হইয়া আসিল বটে, কিন্তু নিজের আকর্ষণের বেগ নিজেই সাম্‌লাইতে না পারিয়া পিছনের বেঞ্চির উপর পড়িয়া গেলেন। ললিতা অস্ফুট-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। এমন সময় ব্যস্তভাবে দরজা ঠেলিয়া নরেন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে ভূপেন আসিয়া দাঁড়াইল।

চম্পটী সাহেব তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিশ ডাকিতে উদ্যত হইয়াছেন। নরেন আগন্তুক ইংরাজের দিকে একবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চম্পটী সাহেবকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল, এবং চম্পটী সাহেব সংক্ষেপে তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে সে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ইংরাজের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর-স্বরে আদেশ করিল, "যাও।"

বলিয়া সে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ইংরাজ তখন পাইপ্‌টা তামাকে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতেছিল; সে মুখ তুলিয়া একবার নরেনের জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে চাহিল, তারপর মুখ নীচু করিয়া দেশালাই জ্বালিতে উদ্যত হইল। নরেন তাহার পাইপ-সমেত হাতটা ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া পুনরায় কঠোর-স্বরে বলিল, "যাও।"

ইংরাজ আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নরেনের মুখের উপর একটা ক্রোধ-তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নামিয়া গেল। নামিতে নামিতে বলিল, "ইংরাজকে এরূপে অপমান করার ফল কি তা অনুভব কত্তে বিলম্ব হবে না।"

নরেন মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তুমি ইংরাজ জাতির কলঙ্ক।"

ইংরাজটা চলিয়া গেলে ললিতা আশ্বস্ত হইয়া নরেনকে লক্ষ্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-কণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে আপনি এসে পড়লেন নরেন বাবু, তা নইলে—"

নরেন হাসিয়া বলিল, "তা নইলে আর হ'তো কি? মিষ্টার চম্পটী কি সহজে ওকে ছেড়ে দিতেন?"

চম্পটী সাহেব কলার নেক্‌টাইগুলাকে ঠিক করিয়া লইতে লইতে বললেন, "এত বড় একটা ষ্টেশন, কিন্তু একটা পুলিস নাই, একজন রেলওয়ে-সার্ভেণ্টের দেখা নাই। ক্যাল্‌কাটায় ফিরে রেলওয়ে-কর্ম্মচারী-দের এই অমনোযোগিতা-সম্বন্ধে ইংলিশম্যানে লিখ্‌তে হবে।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "রেলওয়ে-কর্ম্মচারীদের দোষ কি মিষ্টার চম্পটী? তারা তো প্রত্যেক লোকের পিছনে পাহারা দিতে পারে না। আর সকল সময়ে পরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও চলে না,

নিজেকেও এক-আধটু সাহস বা ক্ষমতা দেখাতে হয়। শুধু 'বলং বলং দৈর্ববলং' না ক'রে 'বলং বলং বাহুবলং' দেখান দরকার।"

ললিতা কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিল; চম্পটী সাহেব বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিলেন। ভূপেন তখন চম্পটী সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঈষৎ তিরস্কারের স্বরে নরেনকে বলিল, "তোমার মত গোঁয়ারগোবিন্দ যারা, তারাই বাহুবলটাকেই মস্ত বল মনে করে। মনে কর, ঐ অসুরের মত জোয়ান সাহেবটা যদি তোমার উপর রুখে দাঁড়াত, তা হ'লে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বল দেখি?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "যেখানেই গিয়ে দাঁড়াক্, তাতে প্রহসনের অভিনয় আদৌ হ'তো না, একটা আস্ত ড্রামা হ'য়ে যেতো। কিন্তু গোল যত ঐ রুখে দাঁড়ান নিয়ে ভূপিদা, চেহারাটা প্রকাণ্ড হ'লেই রুখে দাঁড়ান যায় না, মনের তেজটা প্রকাণ্ড হওয়া চাই।"

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ও ট্রেণের গার্ড্ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতে লাগিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা কিছু শোনা না গেলেও কথার সঙ্গে সঙ্গে বারবার এই গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করিতে দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল, অবমানিত ইংরাজ বীর গার্ডের নিকট স্বীয় অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেছেন। দেখিয়া নরেন অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "দাঁড়াও, বেটার নামে পাল্টা নালিশ কচ্চি।" বলিয়া সে গাড়ী হইতে নামিতে গেল। ভূপেন্ বাধা দিয়া বলিল, "দরকার কি?"

ললিতাও ইহাতে আপত্তি জানাইল, সুতরাং নরেন নামিতে পারিল না। নামিবার প্রয়োজনও হইল না; অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ও গার্ড্ উভয়ে উভয় দিকে চলিয়া গেল। নরেন বলিল, "চলে গেল যে?"

ভূপেন বলিল, "গার্ড সাহেব বোধ হয় বুঝিয়ে দিলে যে, রিজার্ভ গাড়ীতে অপরের প্রবেশাধিকার নাই।"

চম্পটী সাহেব এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, সাহেবটার নাম জেনে লওয়া হ'লো না।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "বলেন তো এখনো গিয়ে জেনে আসতে পারি। কিন্তু ও বেচারাকে আর আদালত পর্য্যন্ত টানাটানি না ক'রে ক্ষমা ক'রে ফেলুন মিষ্টার চম্পটী, ক্ষমাতেই মহতের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।"

বলিয়াই নরেন মুখ টিপিয়া এমন একটু শ্লেষের হাসি হাসিল, যাহাতে চম্পটী সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। তিনি নিঃশব্দে শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিল। নরেন তখন নিজের গাড়ীতে যাইবার জন্য উদ্যত হইল; কিন্তু ললিতা তাহাকে যাইতে দিতে চাহিল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা চাপিয়া দাঁড়াইয়া মিনতির সহিত বলিল, "দোহাই নরেন বাবু, আপনি এই গাড়ীতেই থাকুন।"

তাহার ভয় দেখিয়া নরেন হাসিয়া উঠিল। ভূপেন বলিল, "সেই ভাল নরেন, রাতটা এইখানেই থাক, সকালে তখন নিজের গাড়ীতে যাবে।"

অগত্যা নরেনকে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল। এদিকে চম্পটী সাহেব তখন শয়নের উদ্যোগ করিয়া জলপানের জন্য গ্লাস খুঁজিতে-ছিলেন। কিন্তু ব্যাগের সমস্ত জিনিষ ওলট্-পালট্ করিয়াও গ্লাস পাই-লেন না। ভূপেনও নিজের ব্যাগ খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু গ্লাস কোথাও নাই। ললিতা বলিল, "বোধ হয়, বড় বস্তার সঙ্গে আছে।"

কিন্তু সে বস্তা ব্রেকভ্যানে। চম্পটী সাহেবকে বিপন্ন দেখিয়া নরেন বলিল, "আমার কাছে গ্লাস আছে, এনে দিচ্ছি।"

বলিয়া সে গাড়ী হইতে নামিয়া নিজের গাড়ীর উদ্দেশে চলিল। তখন দ্বিতীয় ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নরেন একটু তাড়াতাড়ি চলিল। কিন্তু রাত্রিতে নিজের গাড়ীটা সহজে চিনিয়া লইতে পারিল না। খানিকটা এদিক-ওদিক খুঁজিয়া শেষে গাড়ী পাইল, এবং তাহাতে উঠিয়া ব্যাগ খুলিয়া গ্লাস লইয়া বাহিরে আসিল। গাড়ী হইতে নামিবা-মাত্র তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। নরেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। এবারেও গাড়ী চিনিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল। যখন চিনিতে পারিল, তখন ট্রেণ অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। নরেন লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না; জনৈক রেল-কর্ম্মচারী আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। ভূপেন জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কণ্টাইরোডে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

গাড়ী প্লাটফর্ম্মের বাহির হইয়া গেল। নরেন গতিশীল ট্রেণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী কণ্টাইরোডে গিয়া দাঁড়াইলে ভূপেন শুধু হাতব্যাগ্‌টা লইয়া ট্রেণ হইতে অবতরণ করিল। সে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই ললিতা ব্যস্তভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ভূপেন তাহার দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তোমার নাম্‌বার কোন দরকার ছিল না ললি।"

ললিতা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে ওয়েটিংরুমের অন্বেষণ করিতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; চম্পটী সাহেব হতবুদ্ধির ন্যায় গাড়ীর মধ্যে একা বসিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

"কি সুন্দর, কি মহান্ দৃশ্য !"

সায়াহ্ন-সূর্য্যের স্বর্ণ রশ্মিতে বিস্তৃত সৈকতভূমি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল; চঞ্চল তরঙ্গরাজি আসিয়া ক্রীড়ারত শিশুর ন্যায় তাহার উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল, আবার চঞ্চল শিশুর মতই তাড়াতাড়ি পিছনে সরিয়া যাইতেছিল। মুহূর্ত্ত পরেই আবার ছুটিয়া আসিয়া কল-কল শব্দে সৈকতবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, আরক্ত সৈকতভূমিতে শুভ্র ফেন-পুষ্প ছড়াইয়া দিয়া আবার পশ্চাতে ছুটিয়া পলাইতেছিল। দূরে নীলাম্বুরাশি নীলাকাশের প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া চক্রবালপ্রান্তে নীলাকাশে মিশিয়া সান্ত মানবের অনন্তাভিমুখী ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে যেন যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই অনন্তের পথে দৃষ্টি রাখিয়া, অনন্তের সহিত অনন্তের মহামিলন দেখিতে দেখিতে মুগ্ধকণ্ঠে ললিতা বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর, কি মহান্ দৃশ্য !"

পাশেই চম্পটী সাহেব বসিয়া, অদূরে সহচরের সহিত হাস্যালাপে নিমগ্না জনৈক ইংরাজরমণীর বিলাস-চঞ্চল অঙ্গভঙ্গীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এবং বিলাতে অবস্থানকালে এইরূপ ইংরাজ-মহিলাকে পরিচারিকারূপে পাইলেও এখানে উঁহাদের সহিত বাঙ্নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিবার অধিকারটুকুও যে নাই ইহাই ভাবিয়া এদেশে ইংরাজের অসমদর্শিতার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে জাতির হৃদয় এই সাগর অপেক্ষা উদার, ঐ আকাশ অপেক্ষা উন্নত ও মহান্, সেই জাতির অন্তরে এতটা সঙ্কীর্ণতা ইহা ভারতের মাটীর গুণ কি না, এবং এই

সঙ্কীর্ণতার ফলে এত বড় জাতিটা আপনার উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে কি না, তাহাই ভাবিয়া ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে ট্রেণের লজ্জাজনক ব্যাপারটাও স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া যে তাঁহার অন্তরকে একটু পীড়িত করিতেছিল না, এবং ইংরাজ-জাতির উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাটাকেও কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিয়া দিতেছিল না এমন কথাও বলা যায় না।

এমন সময় ললিতার উক্তিতে যেন চমকিত হইয়া চম্পটী সাহেব ফিরিয়া চাহিলেন, এবং গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এর 'ভিউ' (দৃশ্য) নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু এটা 'ওস্যান্' নয়, একটা 'বে' মাত্র। ইণ্ডিয়ান ওস্যানের দৃশ্যের তুলনায় এ দৃশ্য কিছুই নয়। যদি কখন তুমি বিলাত যাও—"

ললিতা বলিল, "তার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্য দেখে কি মনে হয় বলুন দেখি, মিষ্টার চম্পটী।"

চম্পটী সোজা হইয়া বসিয়া, মুখে যেন কবিজনোচিত প্রফুল্লতা আনিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মনে হয়, চিরদিন এমনই ভাবে এই দৃশ্যের মনোহারিত্বের মধ্যে ব'সে জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলাকে সার্থক ক'রে নিই।"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল, "কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, যিনি এই বিরাট্ বিশাল দৃশ্যের স্রষ্টা, তিনি আরও কত সুন্দর!"

চম্পটী সাহেবের ঠোঁট দুইটা যেন একটু চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি হন কে?"

ললিতা তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিল, "তিনি বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর।"

চম্পটী সাহেব উচ্চহাসি হাসিয়া পাঠশালার ছেলেদের মত সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন, "ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান, আমরা যাহা বলি—"

ললিতা আরক্তমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্ত্তা আছে?"

চম্পটী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আছে, সে নেচার (প্রকৃতি)। নেচারই সৃষ্টির মূল, একথা বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ ক'রে গিয়েছেন; ঈশ্বর ব'লে কোন জিনিষের প্রমাণ তাঁরা পান নাই।"

ললিতা ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তাঁরা প্রমাণ পান নাই ব'লে যে ঈশ্বর নাই একথা বলা ভুল, আর বিজ্ঞানের সকল 'থিওরি' চিরকাল সমান থাকে না।"

চম্পটী বলিলেন, "ছোট খাট দু'একটার অদল বদল হ'লেও বড় বড় থিওরিগুলা প্রায় ঠিক থাকে। যেমন ধর মাধ্যাকর্ষণ।"

ললিতা ক্ষণকাল শুদ্ধভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বিজ্ঞানের সকল মতই অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করেন?"

"নিশ্চয়! কারণ আজকাল বিজ্ঞানের বলেই জগৎ চল্‌ছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে আপনি ঈশ্বর মানেন না?"

একটুও না ভাবিয়া চম্পটী সাহেব উত্তর দিলেন, "কিছুমাত্র না।"

"কেন মানেন না?"

"যে জিনিষ নাই, তাকে মেনে চল্‌বার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

"নাই, একথা আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

"কারণ, ঈশ্বর যে আছে তার কোন প্রমাণ পাই না।"

"এই জগৎটাই কি তার প্রমাণ নয়? ঈশ্বর না থাক্‌লে এত বড় জগৎটা এলো কোথা হ'তে? কে একে তৈরী কর্‌লে?"

"নেচার (স্বভাব)।"

"আমি বলি ঈশ্বর।"

"হস্তপদ-শূন্য নামহীন রূপহীন ক্রিয়াশূন্য ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, একথা বুদ্ধিমানদের কাছে উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ঈশ্বরের যে হাত-পা নাই, নাম নাই, রূপ নাই, একথা কে বল্‌লে!"

"বড় বড় মুনি-ঋষিরা বলে গিয়েছে। বেদ পুরাণ দর্শন সকলেই তাই বল্‌ছে; হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সকলেই বলে—ঈশ্বর নিরাকার।"

"কিন্তু আমি বলি তিনি সাকার।"

চম্পটী সাহেব বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন। ললিতা স্থির সাগরবক্ষের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমার মনে হয়, এই জগৎটাই তাঁর রূপ; জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তুতেই তাঁর রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ফুলের হাসিতে তাঁর হাসি ফুঠে ওঠে, সাগরের গম্ভীর নাদে তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি শোনা যায়, বাতাসে তাঁর স্পর্শ অনুভূত হয়। এই দেখুন মিষ্টার চম্পটী, এই একটা ক্ষুদ্র ঝিনুক, এর মধ্যে কত কারিগরি, কত বর্ণ-বিন্যাস; এসব তাঁরি হাতের কাজ। লাল ডোরা, তার উপর ফিকে সবুজ ডোরা; এ ডোরা কে টেনেছে? নেচার? কক্ষণো না। আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি মিষ্টার চম্পটী, এসব ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বর আছেন।"

বিশ্বাসের স্থির জ্যোতিতে ললিতার সমগ্র মুখখানা এমনই সমুজ্জ্বল

হইয়া উঠিল যে, চম্পটী সাহেবের মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার এই অস্বাভাবিক দীপ্তিতে সসঙ্কোচে নত হইয়া আসিল। ললিতা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার অনুরোধ মিষ্টার চম্পটী, আপনি বিশ্বাস করুন ঈশ্বর আছেন।"

সেই গম্ভীরনাদী সাগরসৈকতে আসন্ন সন্ধ্যার স্থির গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ললিতার গম্ভীর স্বরটা অনুরোধ হইলেও ঠিক আদেশের মতই চম্পটী সাহেবের কাণে আসিয়া বাজিল। তিনি নিরুত্তরে তরঙ্গায়মান সমুদ্র-বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেনের সহিত ভূপেন আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে বাসায় চলিল। যাইতে যাইতে ভূপেন প্রস্তাব করিল, আজ চা খাওয়ার পর তাসের আড্ডাটা এইভাবে জমাইয়া তুলিতে হইবে, যেন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহার অবসান না হয়। চম্পটী সাহেব সানন্দে এ প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ললিতার মত কি জানিতে চাহিলেন। ললিতারও ইহাতে অসম্মতি হইল না। কিন্তু নরেন বলিল, তাহাকে এক ঘণ্টার জন্য ছুটী দিতে হইবে। ভূপেন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, সে আজ জগন্নাথ দর্শনে যাইবে। শুনিয়া ললিতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ হঠাৎ পুণ্য-সঞ্চয়ের দিকে এত আগ্রহ কেন?"

নরেন সহাস্যে উত্তর করিল, "হাতের কাছে যখন এতটা পুণ্য এসেছে, তখন সেটাকে ছেড়ে যাওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য নয় কি?"

ভূপেন বলিল, "সেরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ কত্তে অবশ্য কেউ তোমাকে অনুরোধ করবে না। তবে আজই সে বুদ্ধিটার পরিচয় না দিলে তোমার বুদ্ধিমত্তার সম্বন্ধে কারো সন্দেহ হবে না।"

নরেন বলিল, "কিন্তু 'শুভস্য শীঘ্রং' একথাটা জান তো?"

ললিতা ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নরেন বাবুর এ শুভ ইচ্ছায় বাধা দিয়ে কাজ নাই দাদা, পুণ্য-সঞ্চয়ে বাধা দিলে নাকি পাপ হয়।"

চম্পটী সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু একটা 'আইডল্' (পুতুল) দেখ্‌লে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, এ বিশ্বাসের আমি প্রশংসা কত্তে পারি না।"

নরেন একটু জোর গলায় বলিল, "আপনার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে আমার কিছুই আসে যায় না মিষ্টার চম্পটী, এপক্ষে আমার নিজের বিশ্বাসই যথেষ্ট।"

চম্পটী সাহেব নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া তিনি যে মনে মনে একটু রাগিয়াছেন ইহা বেশ বুঝা গেল। ললিতা ইহা লক্ষ্য করিয়া যেন চম্পটী সাহেবের পক্ষ লইয়াই বলিল, "কিন্তু আমার বোধ হয় নরেন বাবু, আপনার বিশ্বাস এর ঠিক বিপরীত। জগন্নাথ দেখ্‌লে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, আর সেই পুণ্যরূপ টিকিটের জোরে স্বর্গ নামক স্থানে প্রবেশ করা যায়, এমন বিশ্বাস আপনার নাই।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "ততটা বিশ্বাস না থাক্‌লেও যে কাঠের পুতুলটাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ ক'রে শত শত ক্রোশ দূর হ'তে লোক ছুটে আসে, স্বর্গের জন্য না হ'লেও অন্ততঃ কৌতূহলের জন্যও তাকে দেখা উচিত বোধ করি।"

এ উত্তরে ললিতাকে নিরস্ত হইতে হইল।

বাসায় পৌঁছিলে চা খাওয়ার পর নরেন যখন বাহির হইবার উদ্যোগ করিল, তখন ললিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার যেতে কোন দোষ আছে নরেন বাবু?"

নরেন বিস্ময়ের সহিত একবার ললিতার মুখের দিকে, আরবার ভূপেনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ভূপেনও বিস্ময়-সহকারে বলিয়া উঠিল, "তুই ঠাকুর দেখ্‌তে যাবি ললি?"

ললিতা বলিল, "যদি কোন দোষ না থাকে।"

ভূপেন বলিল, "দোষ একটু নাই কি?"

ললিতা বলিল, "আমি অবশ্য জগন্নাথের পূজা কত্তে যাচ্চি না। শুধু দেখা—"

চম্পটী সাহেব যেন একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হিন্দুর দেবতাকে দর্শন করা ব্রাহ্মধর্ম্মে নিষিদ্ধ।"

ললিতা চকিতে তাঁহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল। ভূপেন বলিল, "ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন বিধানে এমন নিয়ম আছে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে তোর প্রবেশের পক্ষে কোন বাধা আছে কি না সেইটাই জানা দরকার।"

নরেন বলিল, "দেব দর্শনে কারো বাধা আছে ব'লে বোধ হয় না।"

চম্পটী বলিলেন, "কিন্তু আমি জানি, হিন্দু ছাড়া আর কারো মন্দিরে ঢুকবার অধিকার নাই। হিন্দুধর্ম্মে দেবতাও এত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়েছেন যে, অন্য কোন জাতি মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেব দর্শন করলে দেবতা অপবিত্র হ'য়ে যাবেন।"

বলিয়া চম্পটী সাহেব একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন। নরেন ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভুল বুঝেচেন মিঃ চম্পটী, অহিন্দুর দর্শনে দেবতা অপবিত্র হন না, দেবমন্দিরই অহিন্দুর স্পর্শে অপবিত্র হয়। পর্ব্বের সময় দেবতা যখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হন, তখন হিন্দু অহিন্দু যে

কোন্ জাতিই তো দেবদর্শন করে। আসল কথা, যে ভক্ত, ধর্ম্মে যার আস্থা আছে, সে ছাড়া অপরের দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই। আর অবিশ্বাস বা অনাস্থা নিয়ে তার সেখানে প্রবেশও নিরর্থক। হিন্দুর দেবতা হিন্দুর প্রাণের জিনিষ; সে জিনিষকে হিন্দু গর্ব্বের সমক্ষে, অশ্রদ্ধার সমক্ষে খাড়া হ'তে দেয় না। এই জন্যই কেবল অহিন্দু কেন, হিন্দুরও জুতা মোজা প্রভৃতি গর্ব্বের চিহ্ন নিয়ে দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা বলিল, "আপনার ভয় নাই নরেন বাবু, আমি জুতা মোজা নিয়ে যাব না।"

চম্পটী সাহেব ভ্রূকুটী করিলেন। ললিতা তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই একখানা লাল পেড়ে সাড়ী পরিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ভূপেন মৃদু হাসিয়া বলিল, "চমৎকার! ললি একেবারে খাঁটি হিন্দু গৃহস্থের মেয়ে সেজেছে।"

ললিতা সলজ্জভাবে নরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আসুন নরেন বাবু, সাতটা বাজে।"

নরেন উঠিল, এবং চম্পটীর দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ললিতার সহিত বাহির হইয়া গেল। চম্পটী সাহেব মুখখানাকে আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভূপেন তাঁহার এই গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "ললি এখনো বালিকা, তার সকল ত্রুটীই আমাদের কাছে মার্জ্জনীয় মিষ্টার চম্পটী।"

রোষগম্ভীর স্বরে চম্পটী বলিলেন, "বালিকার ত্রুটী মার্জ্জনীয় হ'লেও তোমার এই অনবধানতা কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না।"

ভূপেন হাসিয়া বলিল, "সেজন্য আমি একটুও চিন্তিত নই মিষ্টার চম্পটী। এই মাতৃপিতৃহীনা স্নেহবঞ্চিতা বালিকার জন্য আমি সকল দণ্ডই মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।"

বিজ্ঞোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত চম্পটী বলিলেন, "কিন্তু তোমার এই অন্ধ স্নেহ ললিতাকে বিপথে চালিত ক'রে তার পরিণামটাকে যে ভয়াবহ ক'রে তুলছে, অন্ততঃ সে বিবেচনা করাও তোমার উচিত।"

ম্লানমুখে ভূপেন বলিল, "বিবেচনা আমি করেছি মিঃ চম্পটী, কিন্তু আমি নিরুপায়।"

চম্পটী সাহেবের ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদু হাস্যরেখায় রঞ্জিত হইল। তিনি সহাস্য তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, "তুমি বাস্তবিক নিরুপায় না হ'লেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তোমাকে নিরুপায় ক'রেছে ভূপেন।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "স্নেহের নাম যদি দুর্ব্বলতা হয়, তবে সে অপবাদ আমি স্বীকার ক'রে নিতে রাজি আছি মিঃ চম্পটী।"

চম্পটী সাহেব মুখখানাকে বিকৃত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

"এই কি আপনাদের জগন্নাথ, নরেন বাবু ?"

নরেন বলিল, "জগন্নাথ শুধু আমাদের নয়, জগতের।"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "কিন্তু যিনি জগতের মালিক, তাঁর হাত পা কোথায় গেল ?"

নরেন বলিল, "তিনি 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা'—হস্ত পদ বিহীন হ'লেও তিনি গতিশীল ও গ্রহণ সমর্থ।"

"সে দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তো তাঁর নাম নাই, রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই। তবে তাঁর এমন অদ্ভুত মূর্ত্তির কল্পনা কেন ?"

"ওটা শুধু ভক্তের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নামরূপহীন ব্রহ্মের রূপ কল্পনা।"

"তা হ'লে তো দেখছি মূলে আপনারাও নিরাকারের উপাসক ?"

"নিরাকারবাদের উপরেই হিন্দুর সাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত।"

"তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের প্রভেদটা কি ?"

"প্রভেদ এই যে, হিন্দুরা সাকারের ভিতর দিয়ে নিরাকারকে পেতে চায়; ব্রাহ্মরা সাকারকে একেবারেই অস্বীকার করেন।"

"যা কল্পিত, যা অবাস্তব, তাকে ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মরা মূল লক্ষ্যেরই অনুসরণ ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা মূল লক্ষ্যটাকে বিস্মৃত হ'য়ে অবাস্তবকেই জড়িয়ে ধরে।"

"ঐ মন্দিরের চূড়ায় ওঠা মূল লক্ষ্য হ'লেও ওখানে যাবার জন্য যে

সিঁড়িটা আছে, সেটাকে ত্যাগ করলে চলে না, বরং তাতে লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত হওয়াই অসম্ভব হ'য়ে উঠে।"

"হিন্দুরা কিন্তু অনেক স্থলে মূল লক্ষ্যকে ভুলে সিঁড়িটাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকে।"

"সে থাকে যারা নিম্নশ্রেণীর সাধক। কিন্তু যাঁরা সাধনা দ্বারা চূড়ায় উপস্থিত হ'তে পারেন, তাঁরা সিঁড়িটাকে অপ্রয়োজনীয় বোধে ত্যাগ করেন।"

ললিতা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আপনি যতই তর্ক করুন নরেন বাবু, আপনাদের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে এমনি জড়িয়ে পড়েছে যে, তার উপর আর কোন আসল দেবতা আছে কি না এটা ভাববার অবসরই তারা পায় না।"

নরেন বলিল, "এটা আমি অস্বীকার করি না সত্য, কিন্তু তাই ব'লে ভাববার লোকও যে নাই এমন কথাও বলতে পারি না।"

"কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম।"

"সেটা সকল সমাজের মধ্যেই দেখা যায়। আপনাদের ব্রাহ্ম সমাজে কয়জন পরব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন?"

ললিতা হাসিয়া বলিল, "এবার আপনি রেগেছেন, নরেন বাবু।"

নরেনও মৃদু হাসিয়া বলিল, "রাগের কোন লক্ষণই বোধ হয় আমি প্রকাশ করি নাই।"

ললিতা বলিল, "রাগ না হ'লে মানুষ অপরের ত্রুটীর দোহাই দিয়ে নিজের ত্রুটীর সমর্থন করে না।"

মন্দিরের দরজার বাহিরে প্রশস্ত চাতালের উপর বসিয়া ললিতার সহিত নরেনের কথোপকথন হইতেছিল। রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারায়

মন্দিরচত্বর প্লাবিত হইয়াছিল, সিংহদ্বার হইতে নহবতের মধুর স্বর-লহরী উত্থিত হইতেছিল, যাত্রিগণের কলরবে, জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অদূরে জনৈক উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ বসিয়া ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছিল। রমণীমণ্ডলী তাহাকে বেষ্টন করিয়া তদগতচিত্তে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যাত পুরাণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহারই কিছু দূরে বসিয়া এক বাঙ্গালী যাত্রী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগদ্গুরু,
উদ্ধার করিলে জীবে দিয়ে শ্রীচরণ।
হরি কে জানে হে তব তত্ত্ব নিরূপণ।"

ললিতা বলিল, "আচ্ছা নরেন বাবু, জগন্নাথকে দেখলে আপনার ভক্তি আসে ?"

গম্ভীরভাবে নরেন উত্তর করিল, "ভক্তি জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। এত দূরে পৌছাবার সামর্থ্য আমার মত লোকের নাই।"

মন্দিরচূড়ায় স্বর্ণ কলস চন্দ্রকিরণ সম্পাতে জ্বলিতেছিল; নরেন স্থির দৃষ্টিতে সেই স্বর্ণকলসের উপর রজতধারার বিস্ফুরণ দেখিতে লাগিল।

সম্মুখ দিয়া একদল যাত্রী যাইতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "হ্যাদে বড়মা, ছোট বাবু যে।"

চমকিত হইয়া নরেন ফিরিয়া চাহিতেই সম্মুখে বৌঠানকে দেখিয়া বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল। মহামায়া ঘোমটা সরাইয়া বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো এখানে !"

নরেন কোন উত্তর করিতে পারিল না। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কবে এলে ঠাকুর পো ?"

নরেন নতমুখে উত্তর করিল, "আজ তিন দিন এসেছি।"

মহামায়া বলিল, "আমরা আজ সকালে এসে পৌছেছি।"

ললিতা এতক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; এক্ষণে সে ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া পড়িল, এবং তাহার হাত দুইটা ধরিয়া সহাস্যে বলিল, "আমায় চিনতে পারেন বৌদি?"

তাহার স্পর্শে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া মহামায়া সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "তুমি—তোমরাও এসেছ নাকি?"

ললিতা বলিল, "আমরা এসেছি ব'লেই তো নরেন বাবু এসেছেন। উনি কি আসতে চান; আমিই জেদ ক'রে এনেছি।"

বলিয়া ললিতা একটু হাসিল। মহামায়া কিন্তু হাসিল না, সে ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখেই নরেনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা হ'লে এঁদের ওখানেই আছ বোধ হয়?"

নরেন এবার মুখ তুলিয়া জোর গলায় উত্তর দিল, "হঁা।"

মহামায়ার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; সে ললিতার হাত হইতে আপনার হাত দুইখানাকে মুক্ত করিয়া লইয়া মাথার কাপড়টা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, "তোমার দাদাও এসেছেন। কাল পার তো তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রো।"

বলিয়া মহামায়া আপনাদের বাসার ঠিকানা দিয়া সঙ্গীদের সহিত অগ্রসর হইল। ললিতা বলিল, "আমাকে যেতে বললেন না, বৌদি

উদাস স্বরে "আচ্ছা যেও" বলিয়া মহামায়া প্রস্থান করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং গম্ভীর স্বরে "চলুন" বলিয়া নিঃশব্দে মন্দিরের বাহিরে আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনুকূল মেসের বামুন ঠাকুরকে ডাকিয়া গোপনে বলিয়া দিল, "নরেনের খাবারের ঠাঁই একটু আলাদা ক'রে দেবে।"

খাইতে গিয়া নরেন যখন আর সকলের সঙ্গেই বসিতে উদ্যত হইল, তখন বামুন ঠাকুর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনার এদিকে, আপনার এদিকে।"

নরেন বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। অন্যান্য ছাত্রেরা নরেনের দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। নরেন গম্ভীর কণ্ঠে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঠাঁই ওদিকে হ'বার কারণ ?"

কারণ কি তাহা ঠাকুর জানিত না, সুতরাং সে ইতস্তত: করিতে লাগিল। নরেন তাহার মুখের উপর ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ছাত্রেরা আহারে বসিতে না পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। রমেশ বলিল, "তা ঐটাতেই ব'সো না নরেন বাবু, তাতে দোষ কি ?"

রুক্ষস্বরে নরেন বলিল, "দোষ নাই যখন, তখন তুমিও তো বসতে পার।"

অনুকূল ঘিয়ের বাটীটা উনানের কাছে রাখিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "যে যার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসলে কোনই গোল থাকে না।"

ভ্রূকুটী করিয়া নরেন বলিল, "কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার জন্য কে ঐ জায়গাটা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে।"

অনুকূল বলিল, "যারা এখানকার মালিক, যাদের জাতি ধর্ম্মের ভয় আছে।"

শ্লেষের কঠোর হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "জাতি ধর্ম্মের ভয় এখানকার কার যে আছে, কার নাই, তাতো বলতে পারি না। কিন্তু আমি কি বিজাতি না বিধর্ম্মী?"

অনুকূল বলিল, "আমরা শুনেছি, পুরীতে গিয়ে তুমি ব্রাহ্মদের হাতে খেয়েছ।"

নরেন। একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু পুরীতে জাতিবিচার নাই।

অনু। সে জগন্নাথের প্রসাদে। অন্যত্র বিচার ক'রে চলতে হয়।

নরেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলেও বোধ হয় বিচার নাই?

ছাত্রদের চাপা হাসির শব্দ অনুকূলের কাণে গেল। সে রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "দেখ নরেন, জাতি ধর্ম্ম তামাসার জিনিষ নয়, আর তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক কত্তেও চাই না।"

মেসের অধ্যক্ষ যতীন বাবু বলিলেন, "এ বেলা খাও নরেন, ও বেলা বিচার ক'রে যা হয় করা যাবে।"

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে নরেন বলিল, "উত্তম, বিচার ক'রেই তখন খাওয়া যাবে। কিন্তু একটা কথা আমি ব'লে রাখছি যতীন বাবু, জাতি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যার যে দোষ আছে, সকলেরই বিচার কত্তে হবে। আর শুধু তোমার আমার বিচারে তার নিষ্পত্তি হ'লে চলবে না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা নিয়ে তার মীমাংসা হবে।"

বলিয়া নরেন জোরে জোরে পা ফেলিয়া আহারের স্থান হইতে

বহির্গত হইল, এবং উপরে গিয়া ঝিকে ডাকিয়া খাবার আনিবার জন্য একটা টাকা ফেলিয়া দিল।

ছাত্রদের আহার কার্য্যটা সেদিন নিঃশব্দেই চলিতে লাগিল। সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধিকা বলিল, "নরেনবাবু আজ বড্ডই রেগেছে কিন্তু।"

রমেশ বলিল, "অপমানটাও বড় সহজ করা হয় নি। পঙ্‌ক্তিচ্যুত করা—আমি হ'লে এত বড় অপমানটা এমন সহজে পরিপাক কত্তে পাত্তাম কি না সন্দেহ।"

রাখাল বলিল, "আহা, বেচারীর মুখের গ্রাস!"

তাহাদের এই সহানুভূতি দেখিয়া অনুকূল একটু রাগিতভাবে বলিল, "তাই ব'লে সে যার তার হাতে খেয়ে এসে সকলকে মজাবে নাকি?"

রমেশ মাথা উঁচু করিয়া বলিল, "ওহে, রেখে দাও তোমার হিঁদুয়ানির বড়াই। কত লোক যে মুসলমানের হাতে খেয়ে চলে যাচ্চে।"

বলিয়া সে অনুকূলের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল। অনুকূল কিন্তু এ কথার উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবেই আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। রাখাল বলিল, "নরেন বাবুও কিন্তু সহজে ছাড়বে ব'লে বোধ হয় না; যার যে দোষ আছে দেখিয়ে দেবে।"

অনুকূল এবার বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "কেবল মুখে বললেই তো হবে না, প্রমাণ করা চাই।"

অপরাহ্ণে যতীনবাবু নরেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খেলে হে নরেন?"

নরেন বলিল, "খাওয়া নিতান্ত মন্দ হয় নি, লুচী, আলুর দম, আর দু'টো ডিম আনিয়ে ছিলাম।"

যতীনবাবু নাসাগ্র ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ও বেলা প্রস্তুত অন্নটা খেয়ে এলেই পারতে।"

ঈষৎ তীব্রস্বরে নরেন বলিল, "ইচ্ছা থাকলেও আপনাদের জাত যাবার ভয়ে খেতে পারলাম না।"

কথার ভিতর যে তীব্র শ্লেষ ছিল, সেটুকু নীরবেই পরিপাক করিয়া যতীনবাবু বলিলেন, "এ বেলা কি খাবে ?"

তাচ্ছীল্যের স্বরে নরেন বলিল. "একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকবো।"

"কিন্তু এরকম দোকান আর হোটেল নিয়ে ক'দিন চলবে ?"

"বেশী দিন অবশ্য চলবে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যতীনবাবু বলিলেন, "আমি বলি কি, তার চেয়ে—"

নরেন বলিল, "তার চেয়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ফেলা উচিত। কিন্তু মাথা আমি একা মুড়াব না যতীনবাবু, সেই সঙ্গে অনেককেই মুণ্ডিতমস্তক হ'তে হবে। বোধ হয় আপনিও বাদ যাবেন না।"

যতীনবাবু মাথাটা একটু নাড়িয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "সে কথা আমি বলছি না, কেন না 'ঠক বাছতে গাঁ উজোড়' হয়। আমি বলছি কি জান, এত গোলমালের চেয়ে, মেসের তো অভাব নাই, কলেজষ্ট্রীটে আমার জানা একটা ভাল মেস্ আছে।"

তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া লইয়া নরেন বলিল, "ভাল মেস অনেক আছে, কিন্তু আমার ইচ্ছাটা কি জানেন যতীনবাবু, আগে এই মেসের ধর্ম্মসংস্কার ক'রে দিয়ে তারপর অন্য মেসে যাব।"

গাম্ভীর্য্যের সহিত যতীনবাবু বলিলেন, "বুঝেছি নরেন, কিন্তু

প্রতিহিংসায় মনের নীচতাই প্রকাশ পায়। সেই জন্যই বলছি, যখন উঠেই যাবে, তখন এত গোলযোগে আর দরকার কি ?”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া নরেন গম্ভীর স্বরে বলিল, “বেশ, আপনি ম্যানেজার, আপনি যখন বলছেন—”

বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে যতীনবাবু বলিলেন, “না না নরেন, মনে ক’রো না আমি তোমাকে যেতেই বলছি। বরং তুমি যাওয়ায় আমি বাস্তবিক দুঃখিত। তবে কি জান, আমি গোলযোগ বড় পছন্দ করি না।”

ঈষৎ হাসিয়া নরেন বলিল, “তাই হবে যতীনবাবু, আমি শীঘ্রই গোলযোগের নিষ্পত্তি ক’রে দেব।”

নরেনের স্বরটা অভিমানে ভরা। যতীনবাবু তাহার সে অভিমানের বেদনাটুকু অনুভব করিয়া দুঃখিত ভাবে বলিলেন, “তাই করা ছাড়া আর উপায় নাই নরেন। জান তো, দশচক্রে ভগবান ভূত। মেসের সকলেই যখন তোমার বিরুদ্ধে, তখন একা তুমি বা একা আমি কি কত্তে পারি।”

নরেন ঈষৎ উগ্রস্বরে বলিল, “আপনি কি আজই যেতে বলেন ;

ব্যস্ততার সহিত যতীনবাবু বলিলেন, “না না, আজই তুমি যাবে কোথায় ? আগে একটা জায়গা স্থির ক’রে তার পর—দু’একদিন থাকলে কোন ক্ষতি হবে না।”

চড়া গলায় নরেন বলিল, “থাকবার জায়গা আমার আছে যতীন বাবু, আমি আজই ভূপীদার বাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারি। কিন্তু তা যাব না। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি সময় নিচ্ছি।”

যতীনবাবু ইহাতে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

নরেন চলিয়া যাইবে শুনিয়া মেসের মধ্যে একটা বাদবিতণ্ডা উপস্থিত

হইল। রাখাল বলিল, "নরেন বেচারার উপর কিন্তু নেহাৎ অন্যায় বিচার করা হ'লো।"

অনুকূল ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞভাবে বলিল, "অন্যায় বিচার একটুও হয় নি। নরেন কেবল তোমারি প্রিয় নয়, আমারও প্রিয়। কিন্তু হাতের আঙ্গুল সর্পদষ্ট হ'লে তাকে কেটে বাদ দেওয়াই শাস্ত্রের আদেশ। মহারাজ সগর ধর্ম্মের জন্য আপনার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র অংশুমানকে ত্যাগ ক'রে ছিলেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্য কঠোরতা নিষ্ঠুরতা নয়।"

রাখাল রাগতভাবে বলিল, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'চ্চো অনুকূলদা, কিন্তু ধর্ম্মের কোন্ দিক্‌টা তুমি মেনে চল শুনি? বামুনের ছেলে তুমি, এক দিনের তরেও তো তোমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক কত্তে দেখি নাই।"

অনুকূল বলিল, "সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। ছাত্রাণা-মধ্যয়নং তপঃ—এখন কোশাকুশী নিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করবার সময় নয়; এখন পড়াই তপ জপ, সন্ধ্যা আহ্নিক।"

রাখাল বলিল, "কিন্তু শুনতে পাই, আগে বামুনের ছেলেরা যখন টোলে লেখাপড়া শিখতো, তখন তারা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রহ্মচর্য্য সব সমানভাবে চালিয়ে যেতো।"

রাধিকা বলিল, "সে সংস্কৃত পড়া। তারা কি বি-এ, এম এ পাশ দিত?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক, এখন এম এ পাশের তপস্যা হয় ইংরেজের হোটেলে ব'সে।"

অনুকূল ছাড়া আর সকলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনুকূল রাগে চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "তাই ব'লে বিধর্ম্মীর হাতে খেয়ে এসে সমাজটাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রবে বুঝি?"

রাখাল হাসিয়া বলিল, "কক্ষণো না। সেই 'দুর্গাদাসে'র শ্যামসিং মুসলমান ফৌজের আল্লা হো আকবর চীৎকার শুনে যে ব'লেছিল, 'তাই হোক, এ আমাদের সৈন্য।' তার উত্তরে দিলীর খাঁ কি ব'লেছিল হে সতীশ?"

সতীশ বলিল, "ব'লেছিল, 'হাঁ মহারাজ, আপনাদের সৈন্য ব'লেই আল্লা হো আকবর বলছে, আমাদের সৈন্য হ'লে হর হর বোম বোম বল্‌তো।"

আবার একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। অনুকূল নিরুত্তরে আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, "এখানে ধর্ম্ম নিয়ে যে রকম আন্দোলন চলেছে, তাতে অধার্ম্মিকগণকে বুঝি পথ দেখতে হয়।"

অনুকূল বলিল, "যার ইচ্ছা হবে সে স্বচ্ছন্দে পথ দেখতে পারে। সেজন্য কারো অনুরোধ উপরোধ নাই।"

রাখাল বলিল, "তা হ'লে দেখছি, তুমি দেশশুদ্ধ লোককে এক ঘ'রে ক'রে রাখবে অনুকূলদা।"

সতীশ বলিল, "ধার্ম্মিক লোক 'ধর্ম্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ'।"

এই শ্লেষের উত্তরে অনুকূল কতকগুলা চড়া কথা বলিল। রাখাল প্রভৃতিও তাহার উত্তর দিতে ছাড়িল না। ক্রমে বিবাদটা যখন বেশ জমিয়া উঠিল, তখন যতীনবাবু মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যতীনবাবুর সহিত তর্ক বিতর্কে নরেনের মনটা এমনই তিক্ত হইয়া উঠিল যে, মেসে থাকিতে তাহার ভাল লাগিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িল এবং ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ভূপেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভূপেন তখন বারান্দায় বসিয়া একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। নরেন আসিলে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এই যে নরেন, আজ তিন দিন ছিলে কোথায় ?"

বেঞ্চিখানার পাশে বসিয়া পড়িয়া নরেন বলিল, "এই কলিকাতার মধ্যেই।"

ঈষৎ হাসিয়া ভূপেন বলিল, "আমি মনে করেছিলাম, জননী জন্মভূমিকে বুঝি হঠাৎ মনে প'ড়ে গিয়েছে।"

নরেন বলিল, "জননী জন্মভূমি আমার মাথায় থাকুন, তাঁর কোলে যাবার তরে আমার একটুও আগ্রহ নাই।"

কৃত্রিম রোষের সহিত ভূপেন বলিল, "হতভাগ্য, জন্মভূমির প্রতি এতটা অবজ্ঞা !"

গম্ভীরভাবেই নরেন বলিল, "অবজ্ঞা একটুও নাই ভূপিদা, জন্মভূমিকে আমি যথেষ্ট ভক্তি করি, কিন্তু সে এই সহরে ব'সে। কেন না দূর হ'তে যে সকল জিনিষ সুন্দর দেখায়, তাদের মধ্যে আমাদের জন্মভূমি একটী। দূরে সহরের দিব্য আরামের মধ্যে ব'সে তাঁকে সুজলা সুফলা স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রভৃতি বিশেষণ দিয়ে বেশ স্তব করা যায়, কিন্তু মায়ের সেই জঙ্গলাকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত ক্রোড়ে ব'সে দলাদলির তীব্র

পূতিগন্ধ এবং ম্যালেরিয়ার কঠোর কশাঘাতকে উপেক্ষা ক'রেও যিনি যাকে ভক্তি কত্তে পারেন, তাঁকে যে আমি মহাপুরুষ ব'লে কেবল শ্রদ্ধা করি তা নয়, প্রয়োজন হ'লে তিনি যে মানুষের বুকের উপর দিয়ে ছুরী ছোরাও চালাতে পারেন এমন বিশ্বাসও আমার আছে।"

ভূপেন হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমিই একজন যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক নরেন।"

নরেনও হাসিয়া উত্তর করিল, "এটা খাঁটি সত্য কথা ব'লেছ ভূপিদা।"

বলিয়া নরেন ভূপেনের হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। সম্মুখের একটা প্যারার উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিল, "চমৎকার! সভ্য সমাজের সভ্যতার একটা নিদর্শন শোন ভূপিদা, মিসেস্ ফ্রান্সিস্—"

বাধা দিয়া ভূপেন বলিল, "ডাইভোর্সের মোকদ্দমা তো? পড়েছি।"

নরেন বলিল, "কিন্তু উন্নত সমাজের কি চূড়ান্ত উন্নতির আদর্শ! স্ত্রী-এনেছেন স্বামীর নামে বিবাহ-বন্ধন ছেদনের মোকদ্দমা। আর আমরা এই সভ্যতার অনুকরণ কত্তে যাই।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া ভূপেন উত্তর করিল, "দোষগুণ সকল সমাজেই আছে নরেন। শুধু একটা দিক্ দেখে কোন সমাজেরই বিচার কত্তে নাই। তুমি কি বলতে পার, আমাদের এই দেশেই এমন ঘটনা অসংখ্য ঘটে না। তবে এদেশের স্ত্রীলোকদের সহিষ্ণুতা খুব বেশী, তাই এমন ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত যায় না। নচেৎ এদেশের কত পুরুষ কারণে অকারণে স্ত্রীকে ত্যাগ কচ্চে বল দেখি?"

নরেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু এ দেশের স্ত্রী কোন দিনই ডাইভোর্সের মোকদ্দমা আনতে পারে না।"

ভূপেন বলিল, "বলেছি তো, তার কারণ, এদেশের স্ত্রীজাতির সহিষ্ণুতাটা খুব বেশী। বিশেষতঃ তাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে তারা পুরুষদের সহিত আপনাদের সমান অধিকার কল্পনাতেও আনতে পারে না। কাজেই তারা বড় জোর স্বামীর নামে খোরাক পোষাকের মোকদ্দমাটা পর্য্যন্ত আনতে পারে। তা ছাড়া এদেশের অভিধানে পুরুষদের ব্যভিচার ব'লে কোন শব্দ নাই। ব্যভিচারিণী শব্দটার যত ব্যবহার, ব্যভিচারী শব্দের ব্যবহার তার শতাংশের একাংশও নয়। কাজেই এদেশের পুরুষরা যত অল্প কারণে স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে পারে, স্ত্রীরা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী কারণ সত্ত্বেও স্বামীকে ত্যাগ কত্তে পারে না।"

কাগজের উপর দ্রুত চোখ বুলাইতে বুলাইতে নরেন বলিল, "কিন্তু সেটা পারাকেই কি তুমি ভাল মনে কর?"

ভূপেন বলিল, "ভাল অবশ্য মনে করি না। কিন্তু তাতে বোধ হয় একটা মস্ত উপকার হ'তে পারে, এদেশের স্বেচ্ছাচারী পুরুষগুলা অনেকটা শায়েস্তা হ'য়ে যায়। তারা এমন কথায় কথায় স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে পারে না।"

বলিয়া সে নরেনের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিল। নরেন দৃষ্টি নত করিয়া সংবাদপত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূপেন বলিল, "তুমি বোধ হয় শোননি নরেন, মিষ্টার চম্পটী ললিতার পাণি প্রার্থনা করেছেন।"

নরেন দ্রুত কাগজ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে

বলিল, "এটা যে করবেন, তা আমি আগে থাকতেই অনুমান ক'রে ছিলাম।"

ভূপেন বলিল, "চম্পটী সাহেবের এই দাবীটা আমি অসঙ্গত মনে করি না। কেন না রূপে গুণে চরিত্রে চম্পটী সর্ব্বাংশেই ললিতার উপযুক্ত পাত্র।"

নরেন বলিল, "কিন্তু ললিতা নিজে সেটা স্বীকার করেন ব'লে বোধ হয় না।"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "তোমার এমন অনুমানের কোনই কারণ নাই। ললিতা বেশ প্রসন্নভাবেই চম্পটী সাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে।"

নরেন যেন নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত ভাবেই একবার ভূপেনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; পরক্ষণেই মুখখানাকে বিকৃত করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। ভূপেন তাহা লক্ষ্য না করিয়াই মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "আজকে নিজেই জেদ ক'রে চম্পটী সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।"

নরেন বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কেল্‌নারের বিজ্ঞাপন তালিকায় চোখ বুলাইতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া তাহার দৃষ্টিপথ রোধ করিতে লাগিল, তথাপি সে কাগজ হইতে চোখ তুলিল না। ভূপেন বলিল, "ঘরে চল না, আলো জ্বেলে দিই।"

বিরক্তভাবে "না, থাক্" বলিয়া ভূপেনের কোলের উপর কাগজ খানা ফেলিয়া দিয়া নরেন উঠিতে উদ্যত হইল। ভূপেন বলিল, "উঠচো যে! ললির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না? সে আজ সকালেই আমাকে তোমার মেসে যেতে বল্‌ছিল।"

"কাল সকালে আসবো" বলিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের শব্দ উঠিল, এবং নরেন অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ললিতা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ললিতা হাস্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যে নরেন বাবু, চমৎকার লোক আপনি যা হোক, আজ তিন দিন একেবারে দেখা নাই।"

পশ্চাৎ হইতে চম্পটী সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এজন্য কিন্তু আমি নরেনবাবুকেই দোষী করি না, আমরাই বা কোন্ ওঁকে দেখা দিয়েছি? কি বলেন নরেনবাবু?"

বলিয়া তিনি সহাস্য মুখে অগ্রসর হইয়া নরেনের হাতটা জড়াইয়া ধরিলেন। নরেন তাঁহার এই আকস্মিক প্রসন্নভাব দেখিয়া একটুও বিস্মিত বা প্রীত হইল না; তাঁহার মুখের উপর ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক উপেক্ষাসূচক এক নমস্কার করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"তুমি—আপনি কি চম্পটীসাহেবের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া ললিতা উত্তর করিল, "চম্পটী সাহেব আমার পাণি-প্রার্থী।"

"আপনার পাণি প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা অনেকেই পোষণ করে।"

"চম্পটী সাহেব আমায় ভালবাসেন।"

"সেটা আমিও অস্বীকার করি না।"

"তা হ'লে বোধ হয় তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়াও দোষের হয় নি।"

"দোষের হ'তো না, যদি আপনিও তাঁকে ভালবাসতেন।"

ললিতার হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। নরেন তাহার সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিল, "এই জন্যই বলছি, আপনি এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে ভাল কাজ করেন নি।"

ললিতা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "নরেন বাবু !" ব্য-

নরেন মস্তক সঞ্চালন করিয়া স্থির স্বরে বলিল, "আপনি অবরণ অনুমানের বিরুদ্ধে যতই কেন বলুন না, আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস-"

ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া ললিতা বলিল, "আপনার বিশ্বাস নিয়ে আমার কোন লাভ নাই, এটা কিন্তু আপনার জানা উচিত।" কাজে

এই তীব্র প্রতিবাদেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া নরেন হা বলিল, "কিন্তু লোকসান যে যথেষ্ট আছে সে বিষয়ে কোনই মি নাই।"

ললিতা একথার উত্তর না দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল

নরেন ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া পুনশ্চ বলিল, "বিবেকের বিরুদ্ধে এমন নির্ম্মমভাবে সম্মতি দেওয়ার কারণটা শুনতে পাই কি ?"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবেই উত্তর করিল, "আপনার শুনবার মত কিছুই নাই।"

ঈষৎ অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে নরেন বলিল; "সেটা সম্ভব, যদি আমাকে শুনবার পক্ষে অনধিকারী বিবেচনা করেন।"

সজল দৃষ্টিটা তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ললিতা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমাকে কি মাপ কত্তে পারেন না, নরেন বাবু ?"

ঘাড়টা হেলাইয়া স্থিরস্বরে নরেন বলিল, "কক্ষণো না; আপনার এমন একটা ভয়ানক অন্যায় কার্য্যের সমর্থন, আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।"

ললিতা ঘাড় সোজা করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে পারিল না; বর্ষার প্লাবনের ন্যায় অশ্রুরাশি আসিয়া তাহার দৃষ্টিটাকে ঝাপসা করিয়া দিতেই সে তাড়াতাড়ি আঁচল টানিয়া লইয়া চোখ দুইটা ঢাকিয়া ফেলল। নরেন স্তব্ধভাবে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ললিতা অশ্রুবেগ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া চক্ষু হইতে অপসারিত করিল, এবং নরেনের দিকে সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুণকণ্ঠে বলিল, "আমি মিনতি কচ্চি নরেন বাবু, আপনি এ আর প্রশ্ন করবেন না।"

তাহার দৃষ্টির মধ্য দিয়া, স্বরের ভিতর দিয়া যে কাতরতা ফুটিয়া উঠল, তাহাতেও নরেন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; সে মুখের উপর বিচারকের নির্ম্মম গাম্ভীর্য্য আনিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমিও

মিনতি ক'রে বল্‌চি, যে অন্যায় কাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনি এতটা বিচলিত হ'তে পারেন, সে অন্যায়টাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না।"

"পারবো না।"

"কক্ষণো না।"

বলিয়া নরেন এত জোরে মাথাটা নাড়িল যে, তাহা দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও ললিতার হাসি আসিল। সে দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি দাদার অভিপ্রায় জানেন কি ?"

"দাদার অভিপ্রায় !" বলিয়া নরেন বিস্ময়ে যেন চমকিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "দাদার একান্ত ইচ্ছা—"

নরেন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাস্যধ্বনিতে কক্ষের ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ললিতা সঙ্কোচে মাথাটা আর একটু নীচু করিল। নরেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভূপীদার ইচ্ছা ! আপনি কি ভূপীদাকে চেনেন না ? আশ্চর্য্য !"

বলিয়া নরেন পুনরায় জোরে হাসিয়া উঠিল। ললিতা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন হাসির বেগটা সংবরণ করিয়া বলিল, "ভূপীদা কি এ বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছে ?"

"না।"

"তবে আপনি কেমন ক'রে জানলেন যে, ভূপীদার এমন অন্যায় কাজে মত আছে ?"

ললিতা নিরুত্তরে দণ্ডায়মান। নরেন বলিল, "আচ্ছা, আমি ভূপীদাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

বলিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। ললিতা ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া

বলিল, "না না, আপনাকে আমি মিনতি ক'রে বল্‌চি, দাদাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।"

তাহার কাতরতাপূর্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া নরেন হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। বিমর্ষমুখে বলিল, "অবশ্য এই ব্যাপারের মধ্যে যে কি গুপ্ত রহস্য আছে তা আমি জানি না, আর সেটা জানবার চেষ্টা আমার নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চা ব'লে আপনাদের মনে হ'তে পারে। কিন্তু আপনাকে এতটা ভালবাসি যে, তার কাছে আমার অধিকার অনধিকারের জ্ঞানটাও চাপা প'ড়ে গিয়েছে।"

বলিয়া নরেন বিষাদকাতর দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে চাহিল মুহূর্ত্তে ললিতার সমগ্র মুখখানা দিয়া যেন শোণিতপ্রবাহ ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী টেবিল হার্ম্মোনিয়মটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নরেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপীদা কোথায়?"

ললিতা বলিল, "চম্পটী সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছে।"

নরেন একটু বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আজকাল সেখানে ভূপীদার এত ঘন ঘন যাতায়াত কেন বলুন তো?"

উত্তরে ললিতা মৃদু হাসিয়া হার্ম্মোনিয়মের ডালা খুলিল, এবং তাহাতে সুর দিয়া গান ধরিল,—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।"

চম্পটী সাহেবের সহিত ভূপেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই যে নরেন, রাস্তায় তোমার কথাই হচ্ছিল।"

চম্পটী সাহেব অগ্রসর হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনার মেসের ছেলেরা আপনাকে নাকি এক ঘ'রে ক'রেছে নরেন বাবু?"

মৃদু হাসিয়া নরেন উত্তর করিল, "না, আমিই তাদের সকলকে এক ঘ'রে করেছি।"

গৃহ মধ্যে একটা উচ্চ হাস্যরোল উত্থিত হইল। ললিতা ঈষৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি? নরেন বাবুকে এক-ঘ'রে হ'তে হ'লো কেন?"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "ওর দুর্ম্মতি—আমাদের ঘরে খেয়েছে। হিন্দুসমাজ কি এতটা অনাচার সহ্য কত্তে পারে? বরং মুসলমানের হাতে খেলেও রক্ষা ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মের হাতে—সর্ব্বনাশ!"

হিন্দুসমাজের প্রতি ভূপেনের এই কটাক্ষে নরেন একটু রাগতভাবে বলিল, "ঠাট্টা নয় ভূপীদা, হিন্দুসমাজে স্ববর্ণ ছাড়া অন্যের হাতে খেলেই জাতি যায়, তা সে হিন্দুই হোক্ বা মুসলমানই হোক।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে আপনাকে বোধ হয় মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে?"

জোর গলায় নরেন বলিল, "হিন্দুর শাস্ত্র, সমাজ মানতে গেলে তাই করাই উচিত। তবে গায়ের জোরে আজকাল যে অনেকেই সমাজের বিধান মেনে চলে না, তাতে সমাজের ক্ষতি ছাড়া মঙ্গল কিছুই হচ্চে না।"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা ক'রে, জগতের সকল উন্নতিকে ঠেলে দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আপনার যে ক্ষতি কচ্চে, তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নয় নরেন বাবু।"

নরেন বলিল, "উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাকৃতিক নিয়ম নয় চম্পটী সাহেব। সমাজের উন্নতি কত্তে হ'লে আগে তার শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার।"

ভূপেন বলিল, "তুমি যতই তর্ক কর নরেন, বিদ্যাসাগর, রামমোহনকে

এক ঘ'রে ক'রে, বিলাত-ফেরতদের একপাশে ঠেলে রেখে হিন্দুসমাজ শুধু আচল আর প্রায়শ্চিত্তের কড়ি নিয়ে কোন দিনই উন্নতি কত্তে পারবে না। বড় লোক সমাজের প্রাণ; প্রাণকে বাদ দিয়ে জড় দেহ বেশীক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখতে পারে না। অথচ এই হিন্দুসমাজই একদিন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেছিল, ধীবর-দৌহিত্র দ্বৈপায়নকে বেদবিভাগের অধিকার দিয়েছিল। আর তারই ফলে কত পুরাণ উপপুরাণ, কত সংহিতা উপনিষৎ হিন্দুশাস্ত্রকে জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু এখনকার হিন্দুসমাজ শুধু ত্যাগ নীতি অবলম্বন করেছে, গ্রহণের সামর্থ্য একেবারে হারিয়ে ব'সেছে।"

সহাস্যে নরেন বলিল, "তোমার অভিযোগ অস্বীকার করি না ভূপীদা। যারা রাজৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে কৌপীনমাত্র নিয়ে বনবাস আশ্রয় করে, ত্যাগই যে তাদের মূলমন্ত্র তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর হিন্দুধর্ম্মের যা কিছু গৌরব তা এই ত্যাগের মধ্য দিয়েই।"

ভূপেন বলিল, "কিন্তু কেবল ত্যাগে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হ'য়ে যায়। হিন্দুসমাজেরও এখন সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ত্যাগেরও দুইটা দিক্ আছে। এক ত্যাগে আত্মোন্নতি, আর এক ত্যাগে আত্মহত্যা।"

নরেন বলিল, "কিন্তু গোড়াতেই তুমি ভুল করেছ ভূপীদা, হিন্দু-সমাজের লক্ষ্য এ জগৎটা নয়, এর অপর পারে যে একটা জগৎ আছে সেইখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।"

উত্তরে ভূপেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চম্পটী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর ভূপেন, যে জিনিষটা খুঁজে পাওয়া দায়, তাকে নিয়ে এতটা নাড়াচাড়া করা ভাল নয়। তার চাইতে চা খেয়ে মনটাকে

চাঙ্গা ক'রে নাও, আর জগতে যাতে চায়ের প্রচার বেশী হয় তার চেষ্টা কর।"

ললিতা চা প্রস্তুত করিতেছিল, সে মৃদু হাসিয়া চায়ের কাপগুলা আগাইয়া দিল। দিতে দিতে নরেনের চায়ের কাপটা তাহার সম্মুখে রাখিয়া সহাস্যে বলিল, "আপনার আপত্তি আছে কি না, না জেনেই আপনাকে চা দিয়েছি।"

নরেন হাসিয়া উত্তর করিল, "যখন দিয়েছেন, তখন অগত্যা আমাকে তার সদ্‌ব্যবহার কত্তে হবে। একবারে যে প্রায়শ্চিত্ত, দশবারেও তাই।"

বলিয়া নরেন চায়ের বাটীতে চুমুক দিল। চম্পটী সাহেব চা খাইতে খাইতে নরেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাল কথা নরেন বাবু, ভূপেনের কৌমার্য্য ব্রত ভঙ্গ হ'য়েছে, এ সংবাদ বোধ হয় শোনেন নি।"

নরেন একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বলেন কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "শুধু তাই, আমার বেচারা ছোট বোন লীলাকে আমাদের কাছ হ'তে কেড়ে নেবার তরে উঠে পড়ে লেগেছে।"

নরেন যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, চম্পটী সাহেবের সহিত ললিতার বিবাহের রহস্যটা এতক্ষণে তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া আসিল, এবং ভূপেনের এই স্বার্থপরতায় ঘৃণা ও বিরক্তিতে তাহার মুখখানা গম্ভীরভাব ধারণ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এটা ভূপীদার নিতান্ত অন্যায়। আর আপনারা খুব সহিষ্ণু ব'লেই এমন অন্যায় অত্যাচারটা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন।"

সহাস্যে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "আমরা যে বাস্তবিকই এতটা সহিষ্ণু এমন মনে করবেন না। আমিও এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বো না।"

বলিয়া ললিতার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিলেন। কিন্তু ললিতা তখন পিছন ফিরিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলা একটী একটী করিয়া গুছাইতেছিল। সুতরাং চম্পটী সাহেবের সতৃষ্ণ কটাক্ষটা তাহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিল না; চায়ের পাত্রগুলা লইয়া সে গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে নরেন গাত্রোত্থান করিল। ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি অন্য মেসের সন্ধান কচ্চো?"

নরেন বলিল, "কেবল সন্ধান নয়, একটা মেস ঠিক ক'রে ফেলেছি। বোধ হয় কাল সেখানে উঠে যাব।"

বলিয়া সে দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইল। কিন্তু দরজার বাহিরে আসিতেই হঠাৎ ললিতা তাহার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খুব রাগ হ'য়েছে, না নরেন বাবু?"

নরেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার সহাস্য মুখের দিকে চাহিল। ললিতা দৃষ্টি নত করিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার অনুরোধ, রাগ কত্তে হয় আমার উপর করবেন, দাদার উপর রাগ করবেন না।"

নরেন কোন উত্তর করিল না, শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

কি ভয়ানক স্বার্থপরতা! মানুষ স্বার্থের জন্য এতটা অন্যায়ের সমর্থন অনায়াসে করিতে পারে? ভূপেনকে সে আদর্শ চরিত্র বলিয়াই জানিত। কিন্তু স্বার্থের অনুরোধে সেও যে উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে পারে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। ভূপীদার এতটা অধঃপতন! কিন্তু তাহার এই অধঃপতনের মূলে চম্পটী সাহেবের হাত আছে কি না ইহাই সন্দেহের বিষয়। খুব সম্ভব, ললিতাকে হস্তগত করিবার জন্য চম্পটী সাহেবই এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাতে তাহার দুইটী

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; প্রথমতঃ সে ললিতাকে হস্তগত করিবে, দ্বিতীয়তঃ ভূপীদার স্থায় সচ্চরিত্র ধনবান্ যুবকের হস্তে স্বীয় ভগ্নীকে সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু নরেনের প্রতিজ্ঞা, সে যেরূপেই হউক চম্পটী সাহেবের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া ললিতাকে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিবে। এজন্য সে ললিতার কোন উপরোধ অনুরোধেই কর্ণপাত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে নরেন মেসে উপস্থিত হইলে রাখাল বলিল, "এই যে নরেন বাবু, সন্ধ্যা হ'তে ভদ্রলোকটী এসে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

নরেন সাগ্রহে অপেক্ষাকারী ভদ্রলোকটীকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইয়াই বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল, "একি, গোপী বাবু যে?"

গোপীনাথ ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি এক ঘণ্টার উপর এসে ব'সে আছি ছোট বাবু।"

নরেন তাহাকে বসিতে বলিয়া বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। গোপীনাথ বলিল, "বাড়ীর খবর খুব ভাল নয়, বড়বাবুর কঠিন ব্যারাম। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে নিয়ে যেতে? কি ব্যারাম?"

ম্লানমুখে গোপীনাথ উত্তর করিল, "ব্যারাম অনেক রকম। জ্বর, কাশী, রক্ত ওঠা। সে আপনি গেলেই দেখতে পাবেন। এখন যত শীগ্‌গীর হয় চলুন। বড় মা আপনার পথ চেয়ে আছেন।"

শঙ্কিতস্বরে নরেন বলিল, "কিন্তু এই রাত্রে গাড়ী নাই তো গোপীবাবু।"

গোপীনাথ বলিল, "গাড়ীর দরকার নাই ছোটবাবু, বড়বাবু তো দেশে নাই।"

বর্দ্ধিত বিস্ময়ে নরেন বলিয়া উঠিল, "দেশে নাই?"

গোপীনাথ বলিল, "না, চিকিৎসার জন্য কাল তাঁকে এখানে আনা হ'য়েছে।"

নরেন বলিল, "কলিকাতায় আনা হ'য়েছে? কৈ আমাকে তো কোন খবর—"

আগে হইতে তাহাকে খবর দিয়া তাহার উপরেই বাড়ী ঠিক করিয়া দিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বরেন্দ্রনাথ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায় তাহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। সুচতুর গোপীনাথ কিন্তু এক্ষণে সে কথাটা গোপন করিয়া বলিল, "আপনি কলকাতায় ফিরেচেন কি না জানা ছিলনা, কাজেই—"

নরেন আর কোন কথা না বলিয়াই গোপীনাথের হাতটা চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে টানিয়া লইয়া মেসের বাহির হইয়া পড়িল।

নরেনকে দেখিয়া মহামায়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "কি হবে ঠাকুর পো?"

নরেন আপনার অন্তরের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া, মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল, "ভয় কি? সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে এনে দেখাব, জমিদারী পর্য্যন্ত বেচে দাদাকে বাঁচাব।"

পরদিন নরেন একজন বড় সাহেব ডাক্তার এবং একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী চিকিৎসককে লইয়া আসিল। চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। দারুণ ক্ষয় ব্যাধি তখন বরেন্দ্রনাথের জীবনীশক্তিকে হ্রাস করিয়া আনিয়াছিল। প্রায় এক

বৎসর পূর্ব্বে এই রোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু পরিশ্রমী বরেন্দ্রনাথ তাহাতে তেমন মনোযোগ দিলেন না, জমীদারীর কাজ কর্ম্ম যেমন স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন তেমনই করিতে লাগিলেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমেই ভগ্ন হইয়া আসিল; ক্রমশঃ দেহ রক্তশূন্য, মুখজ্যোতি ম্লান হইতে লাগিল। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন। বরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার উপদেশ পালন করিতে পারিলেন না। জমিদারীর ভার কাহার হাতে দিয়া যাইবেন? কর্ম্মচারীদের তিনি তেমন বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ভার লইবার একজন উপযুক্ত লোক ছিল; সে নরেন। কিন্তু নরেন তখন নিদারুণ অভিমান লইয়া গৃহের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অগত্যা ব্যাধির আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া বরেন্দ্রনাথ ধীরভাবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহামায়া অনেক মিনতি করিয়াও কার্য্যনিরত স্বামীকে কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে উপেক্ষিত ব্যাধি ক্রমেই ভীষণভাব ধারণপূর্ব্বক শ্রমশক্তিকে যখন নিতান্ত ক্ষীণ করিয়া আনিল, তখন বরেন্দ্রনাথ পত্নীর অনুরোধ আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। জমিদারীর ভার কর্ম্মচারীদের হাতে দিয়া তিনি পুরীযাত্রা করিলেন।

কিন্তু এই পুরীযাত্রাই কাল হইল। পথের পরিশ্রমে ও স্নানাহারের অনিয়মে রোগ এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়াই ফিরিতে বাধ্য হইলেন। বাড়ীতে যখন ফিরিলেন, তখন উত্থানশক্তি রহিত হইয়া আসিয়াছে। চিকিৎসক প্রমাদ গণিলেন, এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনাইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কলিকাতা

হইতে ডাক্তার লইয়া আসা অপেক্ষা সেখানে থাকিয়া চিকিৎসা করানই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইল। গোপীনাথ আগে গিয়া বাড়ী ঠিক করিয়া আসিল, তারপর মহামায়া রুগ্ন স্বামীকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

গোপীনাথ কিন্তু কলিকাতার কিছুই জানিত না, সুতরাং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। মহামায়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে নরেনের কথা তাহার স্মরণ হইল। কিন্তু পুরীতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সেই যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর আর তাহার দেখা নাই। মহামায়া তাহাকে বাসার ঠিকানা দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে যায় নাই। এখন সে কলিকাতায় আছে বা অন্য কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহার নিশ্চয়তা নাই। মহামায়া গোপীনাথকে তাহার সন্ধান লইতে বলিল। গোপীনাথ মেসের ঠিকানা জানিত; খুঁজিয়া খুঁজিয়া মেসে গিয়া সে নরেনের সন্ধান পাইল।

নরেন আসিলে মহামায়া অনেকটা সাহস পাইল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা রীতিমত চলিল। সংবাদ পাইয়া ললিতা ও ভূপেন আসিল, এবং ললিতা স্বেচ্ছায় রোগীর সেবার ভার গ্রহণ করিল। এই কার্য্যে তাহার নৈপুণ্য দেখিয়া মহামায়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাহার ধর্ম্মান্তর বিস্মৃত হইয়া তাহাকে আপন সহোদরার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ললিতা ও নরেন পালা করিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিল।

কিন্তু কাল যাহাকে ধরিয়াছে, মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টাও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং বরেন্দ্রনাথকেও কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিল না; মানবীয় চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কাল আপনার

বিজয়- ভেরী বাজাইয়া দিল। অদৃষ্টের নিকট পুরুষকার পরাভূত হইল।

জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া নরেন ভ্রাতৃবধূ ও তিন বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীকে লইয়া লোকজনের সহিত দেশে ফিরিল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাবুর মৃত্যু সংবাদে গ্রামের মধ্যে যে একটা শোকের উচ্চরোল উত্থিত হইল, তাহার ভিতর আন্তরিকতা যতটা থাক্ বা না থাক্, মৌখিক দুঃখ প্রকাশে কেহই বিরত হইল না। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। কেহ বলিল, সমাজের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাহারা বড় বাবুর মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইত না, তাহারা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিতে লাগিল, "বড়বাবু গরীবের মা বাপ ছিলেন।" জানকী ঘোষাল, সর্ব্বেশ্বর আকুলি প্রভৃতি বিজ্ঞ প্রবীণগণ শুধু বাহিরে শোক প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তাঁহারা অসামান্ত ধৈর্য্যবলে আপনাদের শোক কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ভ্রাতৃ-শোকাকুল নরেনকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন। কিন্তু মৃতের জন্ত কেবল শোক প্রকাশ করিলেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না, তাহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্ত যে সকল শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বিহিত আছে তাহা সম্পন্ন করাও অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। সুবিজ্ঞ প্রবীণগণ নরেনকে সে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিলেন না, এবং নরেনের মতামত প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহারা এ সম্বন্ধে অবস্থানুরূপ মোটামুটি একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিলেন। ইহা তেমন সুখের কাজ নয়, সুতরাং দানসাগর প্রভৃতি আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। তথাপি যেমন মানসম্ভ্রম, নামডাক, তদনুরূপ কার্য্য করিতেই হইবে, নতুবা সমাজে মাথা হেঁট হইবে। একটী রূপার ও একটী পিত্তলের ষোড়শ এবং বৃষোৎসর্গ করিতেই হইবে। শ্রাদ্ধের দিনে দশ সহস্র না হউক, দশ

শূদ্র ব্রাহ্মণকেও পক্বান্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করা দরকার, পরদিন অন্নযজ্ঞ তো আছেই। ন্যূন পক্ষে একশত ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আহ্বান করা আবশ্যক, নতুবা সভামণ্ডপ মানাইবে কেন? গ্রামের ব্রাহ্মণদের জন্য এক একটা তৈজস এবং উপযুক্ত পরিমাণে এক একটা ভোজ্য দিতে হইবে। আহা, বড়বাবু তো আর বিষয় ভোগ করিতে ফিরিয়া আসিবেন না, এ সময়ে তাঁহার উদ্দেশে যাহাই প্রদত্ত হইবে, স্বর্গে বসিয়া তাহাই তিনি পাইবেন।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে চার দিন কাটিয়া গেল, মাঝে আর ছয়টা দিন মাত্র। ইহারই মধ্যে সকল উদ্যোগ আয়োজন করিয়া ফেলিতে হইবে। তা জমিদারবাড়ীর কাজ, লোকজনের অভাব কি? ছোটবাবুর হুকুমে দেশ শুদ্ধ লোক আসিয়া মাথা দিয়া পড়িতে পারে।

নরেন গিয়া মহামায়াকে এই সকল ব্যবস্থার কথা জানাইল। মহামায়া বলিলেন, "তিনি বুক দিয়ে বিষয় রক্ষা ক'রে গিয়েছেন ঠাকুরপো, এখন তাঁর জন্যে যা করলে ভাল হয় তাই কর।"

নরেন বাহিরে আসিয়া কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া আদেশ দিল, "দাদার শ্রাদ্ধে যেন তিলমাত্র ত্রুটী না হয়।"

গোপীনাথ সগর্ব্বে উত্তর করিল, "আপনার কোন চিন্তা নাই ছোটবাবু, রাজবাড়ীর কাজ ঠিক রাজবাড়ীর মতই হবে।"

তখন চারিদিকে উদ্যোগ আয়োজনের সাড়া পড়িয়া গেল; মহলে মহলে সংবাদ ছুটিল; দেশ বিদেশ হইতে ভারে ভারে জিনিষপত্র আসিয়া ভাণ্ডারজাত হইতে লাগিল। চাকর বাকরদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ঘোষাল মহাশয়, আকুলি মহাশয়, বোসজা মহাশয় প্রভৃতি মহাশয়গণ সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জমিদার বাড়ীর কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য দিবারাত্রির

অধিকাংশ সময়ই জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানায় হাজিরা দিতে লাগিলেন, এবং প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ও অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাম্রকূটধূম উদ্গিরণপূর্ব্বক কোথায় কে কবে মহাসমারোহে মাতৃপিতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, এবং সেই শ্রাদ্ধে তাঁহাদের মধ্যে কে কোন্ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহারই গল্প করিতেন, এবং প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ আদেশে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গমনকালে, কোন্ স্থান হইতে কোন্ দ্রব্য আসিল ভাণ্ডারে গিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং ভাণ্ডারের পারিপাট্য দর্শনে শতমুখে ভাণ্ডারীর প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নমুনা সংগ্রহ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ইহাতে ভাণ্ডারী মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখে কিছু বলিতে পারিত না।

এইরূপে ঘোষাল মহাশয় একদিন নমুনাস্বরূপ এক বৃহৎ কুষ্মাণ্ড স্কন্ধে বহির্গত হইবার কালে নরেনের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। ছোটবাবুকে দেখিয়াই তিনি প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেলেন, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সংবরণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আহা ছোটবাবু, সার্থক বড়বাবু আপনার মত ভাইকে রেখে স্বর্গে গিয়েছেন। অনেক বড় বড় কাজ দেখেছি, কিন্তু ভায়ের শ্রাদ্ধে এত আয়োজন কখন দেখি নাই। সকল জিনিষই পর্ব্বতপ্রমাণ। আজ মুকুন্দপুর হ'তে দু'গাড়ী কুমড়ো এসেছে। শুনতে পাই, মুকুন্দপুরের কুমড়ার মত মিষ্ট কুমড়া এ তল্লাটে আর জন্মে না। তাই বেছে বেছে একটা ছোট কুমড়া পরখ ক'রবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

নরেন চাকরকে ডাকিয়া কুমড়াটা ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে

পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে আদেশ দিল। ঘোষাল মহাশয় অজস্র আশীর্ব্বাদে বাটী মুখরিত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

ভাণ্ডারী সম্মুখীন হইয়া নিবেদন করিল, "এই বামুনগুলোর জ্বালায় অস্থির ছোটবাবু, একটা কিছু হাতে না নিয়ে যাবে না।"

নরেন গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "এই বামুনগুলো দু' একটা জিনিষ নিয়ে গেলে যদি জিনিষ কম পড়ে, তা হ'লে এমন কাজে হাত দেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে।"

ভাণ্ডারী লজ্জায় মস্তক নত করিল।

মহামায়া নরেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবৌকে আনবার কি হ'বে ঠাকুরপো?"

নরেন গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "না আন্‌লে কোন ক্ষতি আছে কি?"

মহামায়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে গালে হাত দিয়া বলিলেন, "অবাক্ করলে ঠাকুরপো, ছোটবৌ না এলে চলে? আর আস্‌বেই না কেন?"

এ 'কেন'র উত্তর নরেন দিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া হাতের কাগজখানা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল।

মহামায়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো?"

নরেন মুখ তুলিয়া চাহিল। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবৌ কি নিজের হুকুমে বাপের বাড়ী গিয়েছে?"

মস্তক নত করিয়া নরেন উত্তর দিল, "না।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে?"

নরেন নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। শুধু তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য

ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। অনেকদিন হইতেই মহামায়ার মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে নরেনের ভাব দেখিয়া সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তিনি শঙ্কাবিবর্ণ-মুখে নরেনের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ ঠাকুরপো, লেখাপড়া শিখলেও তুমি এখনো ছেলে মানুষ। স্বামী স্ত্রীর যে সম্বন্ধ সে অচ্ছেদ্য, কোন বিবাদ বিসম্বাদেই তা ছিন্ন হয় না।"

নত মস্তকেই নরেন উত্তর করিল, "আর স্ত্রী যদি স্বামীকে ঘৃণা করে?"

বিস্ময়ের সহিত মহামায়া বলিলেন, "ছোটবৌ তোমাকে ঘৃণা করে?"

নরেন বলিল, "ঘৃণা না করলেও আমি তার কাছে অপবিত্র,

মহামায়া হাসিয়া উঠিলেন; নরেনের মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মহামায়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সাধে কি বলি ঠাকুরপো, তুমি এখনো নেহাৎ ছেলে মানুষ। আর সব কাজে তুমি আপনাকে যতই বুদ্ধিমান্ মনে কর, মেয়েমানুষকে বুঝ্‌তে তোমার এখনো অনেক দেরী।"

নরেন নীরবে কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ টানিতে লাগিল। মহামায়া হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "এ সব ছেলে মানুষির কথা ছেড়ে দাও, ছোটবৌকে আন্‌তেই হবে। না আন্‌লে লোকে কি ব'লবে? আর আলাদা 'ঘাট' তো কত্তে নাই।"

নরেন নিরুত্তর। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?"

নরেন ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "যদি না আন্‌লে দোষ হয়, তা হ'লে আন্‌তে পার।"

বলিয়া নরেন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে বৈঠকখানায় তখন তুমুল তর্ক-যুদ্ধ চলিতেছিল। সেখানে গ্রামের নবীন প্রবীণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; নরেনের দুই চারিজন কর্ম্মচারীও ছিল। তাহাদের বাদপ্রতিবাদের উচ্চ রোলে বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গুরুমহাশয়ের আবির্ভাবে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের ন্যায় নরেনের উপস্থিতিতে মুহূর্ত্তে সমবেত কণ্ঠমুখরিত গৃহ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, এবং সকলেই পরস্পর মুখের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের এই আকস্মিক নীরবতায় নরেন একটু সন্দিগ্ধ হইলেও সে সেই সন্দেহের ভাবটা প্রকাশ না করিয়াই গোপীনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ পত্রগুলা পাঠাবার কথা ছিল। সেগুলা পাঠান হ'য়েছে ?"

গোপীনাথ উত্তর দিল, "সে সব ও বেলাই পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে—"

কথাটা শেষ না করিয়াই গোপীনাথ মস্তককণ্ডূয়নে মনোনিবেশ করিল।

নরেন ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "তবে এখন কোন্ কাজটা বাকী তাই জান্‌তে চাই।"

গোপীনাথ এবার মস্তক কণ্ডূয়ন হইতে বিরত হইয়া করতল মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইল। নরেন তাহার দিকে একটা তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঘোষাল মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ভাল কথা, নিমন্ত্রণটা কি আমি নিজে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে না করলে চল্‌বে না ?"

ঘোষাল মহাশয় মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন, "সেইটাই প্রশস্ত প্রথা।"

নরেন বলিল, "কিন্তু আপনাদের সকল বিষয়েই তো অনুকল্পের

বিধান আছে। এক্ষেত্রেও প্রশস্তের একটা অপ্রশস্ত অনুকল্প বিধান করুন না।"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গোকুল চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিলেন। পশ্চাৎ হইতে সর্ব্বেশ্বর আকুলি বলিয়া উঠিলেন, "অবশ্য সেটা কত্তেই হবে, আর তাই করাই উচিত। জমিদার ভূস্বামী, রাজা; রাজা পিতৃতুল্য এ কথা শাস্ত্রের আদেশ। সুতরাং পিতা যে সন্তানতুল্য প্রজাদের দ্বারস্থ হ'য়ে নিমন্ত্রণ না করলে প্রজাদের অপমান হবে, এমন কথা আমি তো বলতে পারি না। কি বল হে বোসজা?"

বোসজা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "অবশ্য অবশ্য।"

ঘোষাল মহাশয় যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন, "উত্তম, সকলের যদি এই মত হয়, তবে আমারও তাতে আপত্তি নাই। তবে ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি হওয়া চাই।"

সহাস্যে "তাই হবে" বলিয়া নরেন প্রস্থানোদ্যত হইল। ঘোষাল মহাশয় তখন একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ছোটবাবু—"

নরেন ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং কিন্তুর পরবর্ত্তী বক্তব্যটা কি শুনিবার জন্য ঘোষাল মহাশয়ের মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ঘোষাল মহাশয় কিন্তু বক্তব্য শেষ করিবার অবসর পাইলেন না, কাশির বেগটা বার বার আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অন্যান্য সকলে বক্র কটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘোষাল মহাশয়ের চেষ্টাকৃত কাশির বেগটা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বেগটা মন্দীভূত হইলে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বলবার আছে কি?"

ঘোষাল মহাশয় গোকুল চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিলেন। চক্রবর্ত্তী কিন্তু মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ঘোষাল মহাশয় হতাশভাবে আর দুই একজনের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কি জানেন ছোটবাবু, কথাটা কি জানেন, অপর কিছুই নয়। তবে, আচ্ছা, সময়ান্তরে হবে।"

সর্ব্বেশ্বর আকুলি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ আপনার নিতান্ত অন্যায় ঘোষাল মহাশয়, যা বলতে হবে তা স্পষ্ট বলাই ভাল। আর সেটা আপনারও একার কথা নয়, আমারও একার কথা নয়, সমাজের কথা, পাঁচ জনের কথা।"

ঈষৎ হাসিয়া নরেন বলিল, "ভাল, পাঁচজনের সে কথাটা আপনিও অনায়াসে বলতে পারেন।"

আকুলি জোর গলায় বলিলেন, "খুব পারি, আর এই জন্যই আমার ঠোঁটকাটা আকুলি খেতাব। কথাটা এই ছোটবাবু, আপনাকে একটা প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে।"

মস্তক উন্নত করিয়া গম্ভীরস্বরে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত?"

আকুলি বলিলেন, "আমরা পরম্পরায় অবগত হ'য়েছি যে, আপনি ব্রহ্মজ্ঞানীদের অন্ন স্পর্শ ক'রেছেন।"

নরেনের মুখখানা ভ্রূকুটীভঙ্গে ভীষণ হইয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই মস্তক নত করিয়া বলিলেন, "যদি বলেন, আমরা এর প্রমাণও উপস্থিত কত্তে—"

বাধা দিয়া ক্রোধগম্ভীরস্বরে নরেন বলিল, "আপনাদের সে জন্য কষ্ট স্বীকার কত্তে হবে না, আমি আপনাদের অভিযোগ স্বীকার করে নিচ্চি।"

সকলেই তাহার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আকুলি বলিলেন, "যখন নিজেই আপনি স্বীকার ক'রে নিচ্চেন, তখন আপনাকে এর প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে।"

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রাহ্মরাও হিন্দু, তাদের হাতে খেলে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়, এমন বিধান কোন্ শাস্ত্রে আছে?"

আকুলি বলিলেন, "আমরা শাস্ত্রজ্ঞ নই ছোটবাবু, যিনি শাস্ত্র জানেন, তিনিই আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবেন, আর তিনিই প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করবেন।"

"কিন্তু সে ব্যবস্থা যদি আমি স্বীকার না করি?"

"সমাজ আপনাকে ত্যাগ করবে।"

"সমাজ কে? আপনারা তো? আপনারা আমাকে ত্যাগ করলে আমার কোন ক্ষতি নাই।"

আকুলি দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধ-সমুচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার মত বালকের উপযুক্ত কথা বটে। তা হ'লে আপনি সমাজকে ত্যাগ কচ্চেন?"

ঘোষাল মহাশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া আকুলিকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আকুলি শান্ত হইলেন না, তিনি তীব্র তিরস্কারের স্বরে ঘোষাল মহাশয়কে বলিলেন, "সমাজের চেয়ে জমিদার বড় নয় ঘোষাল মশায়।"

ঘোষাল মহাশয় নীরব হইলেন। নরেন ধীর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "এ ক্ষেত্রে আমি জমিদার নই। আমি একজন সাধারণ লোকের মতই বলছি, আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করি নাই, যাতে প্রায়শ্চিত্ত করা আমি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি। আর প্রায়শ্চিত্ত মানে তো কিঞ্চিৎ

কাঞ্চনমূল্য দান। আমি তেমন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজের কপটতা বৃদ্ধি কত্তে চাই না।”

বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে বৈঠকখানা ত্যাগ করিল। সকলে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মহামায়া বলিলেন, "এমন অন্যায় কাজ কেন করলে ঠাকুর পো ?

নরেন বলিল, "অন্যায় আমি একটুও করি নাই, সমাজই আমার উপর অন্যায় জবরদস্তি কচ্চে।"

মহা। কিন্তু সমাজের এই জবরদস্তি সহ্য কত্তেই হবে।

নরে। মানুষে এত জবরদস্তি সহ্য কত্তে পারে না।

মহা। সাত পুরুষ ধরে তো তাই সহ্য ক'রে আস্‌ছ ?

নরে। তারই ফলে সমাজ দিন দিন এমন স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেছে।

মহা। কিন্তু স্বেচ্ছাচার তোমার একার চেষ্টায় দূর হ'তে পারে না।

নরে। একার চেষ্টায় না হোক, পুরুষ পরম্পরার চেষ্টায় দূর হবে।

মহা। কিন্তু সে দু'এক দিনের কথা নয়, ঠাকুর পো।

নরে। দু'এক দিন কেন, দু'দশ বছরেরও কথা নয়।

মহা। অথচ তোমার দু'দিন অপেক্ষা ক'রবার সময় নাই।

ঈষৎ হাসিয়া নরেন বলিল, "দাদার শ্রাদ্ধের কথা বল্‌ছো ? সেজন্য তুমি কিছু ভেবো না বৌদি, দেখবে পয়সার জোরে কত বড় বড় টিকী-ওয়ালা বামুন এসে পাতা পেড়ে খেয়ে যাবে।"

বিরক্তি সহকারে মহামায়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ সজ্জনকে এমন সব কথা বলা ভাল নয় ঠাকুর পো। এতে ব্রাহ্মণদের কিছু না হোক, নিজেরই নীচতা প্রকাশ পায়।"

নরেন গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল। মহামায়া বলিলেন, "কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত যে তোমাকে কত্তেই হবে ঠাকুর পো?"

গম্ভীরভাবেই নরেন উত্তর করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিলেন, "তুমিই যখন শ্রাদ্ধ করবে, তখন তোমার হাতের জল শুদ্ধ হওয়া চাই। নয় তো সে জলপিণ্ড তিনি গ্রহণ করবেন না।"

রুক্ষস্বরে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আমার হাতের জলটা অশুদ্ধ হ'লো কিসে শুনি।"

মহামায়া বলিলেন, "যারা আমাদের ধর্ম্মের বাইরে চলে গিয়েছে, যারা আমাদের ঠাকুর দেবতা মানে না, আচার ব্যবহার পালন করে না, তাদের হাতে যখন তুমি খেয়েছ, তখন তোমার হাতের জল অশুদ্ধ বৈকি।"

তীব্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "কাহণ কতক কড়ি উৎসর্গ করলেই কি সব শুদ্ধ হ'য়ে যাবে?"

মহামায়া বলিলেন, "যখন শাস্ত্রে বলছে শুদ্ধ হবে, তখন নিশ্চয়ই তা হবে। মুনি ঋষিদের চাইতে তুমি কি বেশী পণ্ডিত?"

নরেনের ইচ্ছা হইল সে বলে, এ সকল বিধান মুনি ঋষিদের নয়, আমাদেরই মত মানুষের তৈয়ারী। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় আস্থা-সম্পন্না এবং অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বাক্যমাত্রকেই শাস্ত্রজ্ঞানে বিশ্বাসপরায়ণা বৌদির নিকট সে সকল তর্কের কোনই মূল্য নাই বুঝিয়া নরেন সে তর্ক উত্থাপন করিতে পারিল না; সে ক্রোধগম্ভীর মুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। মহামায়া তাহার রোষবিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "রাগ ক'রো না ঠাকুর পো, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। কিন্তু সকল কাজে ছেলেমানুষি দেখালে চলে না। মনে

কর, তোমার দাদা স্বর্গে গিয়ে তোমার হাতের এক গণ্ডুষ জলের আশায় ব'সে আছেন, কিন্তু তুমি নিজের জেদ বজায় কত্তে গিয়ে যদি তাঁর সে আশা পূর্ণ না কর, তবে সেটা তোমার পক্ষে ভাল হয় কি ?"

মহামায়ার কণ্ঠস্বর গাঢ়, চক্ষু দুইটা সজল হইয়া আসিল। তিনি সেই জলভরা দৃষ্টি নরেনের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শোকগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "অন্ততঃ তাঁর তৃপ্তির জন্যও প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তাঁকে এক গণ্ডুষ জল দেওয়া তোমার উচিত।"

এই সকাতর প্রার্থনার কাছে সকল প্রতিজ্ঞা, সকল যুক্তি তর্ক ভাসিয়া গেল। নরেন আপনার সজল দৃষ্টি উন্নমিত করিয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ঠিক বলছো বৌদি, আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শ্রাদ্ধ করলে দাদার তৃপ্তি হবে ?"

মহামায়া আঁচলে চোখ মুছিয়া স্থির স্বরে বলিলেন, "হবে ঠাকুর পো, আমি বলছি হবে। শাস্ত্রের কথা কখন মিথ্যা হয় না।"

নরেন বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল ; স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল "শাস্ত্র টাস্ত্র আমি জানি না, তুমি যখন বলছো, তখন আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো।"

বলিয়া নরেন বহির্গমনোদ্যত হইল। মহামায়া বলিলেন, "এখনি যাও কোথায় ? আমি হবিষ্য চড়িয়েছি যে।"

অগ্রসর হইতে হইতে নরেন উত্তর দিল, "ফিরে এসে হবিষ্য হবে।"

মহামায়া আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নরেন দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। মহামায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলে নেত্র মার্জ্জনা করিলেন।

নরেন বাহিরে গিয়া ঘোষাল মহাশয় প্রভৃতি সামাজিকগণকে আহ্বান করিবার জন্য গোপীনাথকে আদেশ দিল।

অপরাহ্নে সকলে সমবেত হইলে নরেন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি শুনলাম, প্রায়শ্চিত্ত না করলে শুধু যে সমাজগত দোষ হয় তা নয়, তার প্রদত্ত জলপিণ্ডে পরলোকগত আত্মারও তৃপ্তি হয় না। অগত্যা আমি প্রায়শ্চিত্ত কত্তে সম্মত। এখন আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলুন।"

সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। ঘোষাল মহাশয় হর্ষগদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার যেমন বংশে জন্ম, তার উপযুক্ত কথাই ব'লেছেন ছোটবাবু। ভুবন বাবুর মত ধার্ম্মিক লোক অতি বিরল; তাঁর পুত্র কখন অধার্ম্মিক হ'তে পারে না; পদ্মরাগ মণির আকরে কাচ জন্মে না। কিন্তু কথা হচ্চে, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদাতা তো আমরা নই, যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁদের কাছেই ব্যবস্থা নিতে হবে।"

তখন কাহার নিকট ব্যবস্থা লওয়া হইবে ইহা লইয়া কথা উঠিল। কেহ ব্রজনাথ শিরোমণির নাম করিল, কেহ বা পার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য পণ্ডিতের কাছে যাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু তিন চারি ক্রোশের মধ্যে আর তেমন বড় পণ্ডিত কেহ ছিলেন না; তিন চারি ক্রোশ দূরে গিয়া ব্যবস্থা লওয়াও আজ আর হইতে পারে না। অগত্যা অনেকের মতে ব্রজনাথ শিরোমণিই ব্যবস্থাদাতা বলিয়া মনোনীত হইলেন। যাহারা শিরোমণিকে চিনিত, তাহারা ইহাতে নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু যাহারা ভাল চিনিত না, তাহারা, জামাতার উপর শ্বশুরের ব্যবস্থা যথাশাস্ত্র হইবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কিঞ্চিৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিল।

শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, শিরোমণি মহাশয় ব্যবস্থা দিবার জন্য এখানে আসিতে অনিচ্ছুক; তাঁহার মতে ব্যবস্থা-প্রার্থী ব্যবস্থাদাতার দ্বারস্থ হইয়া ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে ইহাই নিয়ম। তিনি এখানে আসিলে সে নিয়মের অন্যথা হইতে পারে।

শুনিয়া নরেন ক্রোধে ভ্রূকুটী করিল। কিন্তু আকুলি মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন, শিরোমণি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। আর তাঁহার দ্বারস্থ হইতে লজ্জাও কিছুমাত্র নাই, পণ্ডিত সকলের বরেণ্য; বিশেষতঃ তিনি যখন নরেনের শ্বশুর, গুরুজন, তখন সেখানে গেলে নরেনেরও অপমান নাই।

মান হউক বা অপমান হউক, নরেন তখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং মান অপমানের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সে ইহাতে সম্মত হইল। তখন ঘোষাল মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি নরেনকে সঙ্গে লইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

শিরোমণি তাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত বসাইয়া নরেনকে বসিবার জন্য কুশাসন দিলেন। অতঃপর ঘোষাল মহাশয় নরেনের পক্ষ হইতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রার্থনা করিলে শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত হইয়াছে কি না। এ প্রশ্নের উত্তর ঘোষাল মহাশয় দিতে পারিলেন না; নরেন স্বয়ং উত্তর দিল, সে জ্ঞানপূর্ব্বক এই কার্য্য করিয়াছে। শিরোমণি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ভবিষ্যতে এমন কাজ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হ'বার সঙ্কল্প করেছ কি না।"

নরেন উত্তর দিল, "ভবিষ্যতে কি করা হবে না হবে সে কথা পূর্ব্বে কেউ বলতে পারে না।"

শিরোমণি বলিলেন, "ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান ইচ্ছার কথা অনায়াসেই বলা যায়।"

রুক্ষস্বরে নরেন বলিল, "আপনার কাছে বর্ত্তমান পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানতে আসা হ'য়েছে, ভবিষ্যতের আলোচনায় প্রয়োজন নাই।"

মৃদুগম্ভীর হাস্যসহকারে শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "প্রয়োজন সম্পূর্ণ আছে নরেন, মনে ক'রো না, কয় কাহণ কড়ি উৎসর্গেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

নরে। তা নয় তো প্রায়শ্চিত্ত আবার কি ?

শিরো। পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ।

নরে। আর এই কড়ি উৎসর্গ ?

শিরো। এটা সামাজিক দণ্ড মাত্র।

নরে। আপনি এখন এই সামাজিক দণ্ডেরই ব্যবস্থা দিন। অনুতাপ আমার একটুও হয় নি, এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ যে আমি করবো না একথাও স্বীকার কত্তে পারি না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শিরোমণি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে আমার মতে তোমার পক্ষে কড়ি উৎসর্গরূপ প্রহসনের অভিনয় বৃথা।"

নরেন বলিল, "আমি এরূপ অভিনয়ের পক্ষপাতী নই। সমাজ বলপূর্ব্বক আমাকে এই অভিনয় করাচ্ছে।"

শিরোমণি বলিলেন, "সেটা সমাজের ভ্রম। আর এই ভ্রমের বশেই

সমাজে পাপীর সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হ'য়েছে। কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ তা নয়। মনু বলেছেন—

"কৃত্বা পাপান্ হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈতৎ কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ॥"

অর্থাৎ পাপানুষ্ঠানের পর পাপী যদি অনুতপ্ত হয়, এবং সেরূপ কাজ পুনর্ব্বার করবে না ব'লে যদি সঙ্কল্প করে, তবেই তার পাপমুক্তি হয়। নতুবা কেবল কড়ি উৎসর্গে পাপের মোচন হয় না।"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "সে কথা সত্য শিরোমণি মশায়! কিন্তু 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' এখন যে রকম কাল পড়েছে, সেই রকমেই চলতে হবে। আর তাই চলে আসছে। যাক্, তর্ক বিতর্কে আর দরকার নাই, আপনি তৎপর ব্যবস্থাটা দিন।"

শিরোমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ব্যবস্থা আপনাদের মনঃপূত হবে কি?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "আপনার ব্যবস্থা মনঃপূত হবে না? বলেন কি? আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তুল্য।"

ঈষৎ হাসিয়া শিরোমণি বলিলেন, "উত্তম, সেই বিশ্বাসই যদি আপনাদের থাকে তবে আমার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমার ব্যবস্থায় নরেন প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি যে সমাজ-বিগর্হিত কাজ ক'রেছেন, তার জন্য যতদিন না তাঁর মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়, এবং এরূপ কাজ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হবেন ব'লে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হন, ততদিন তিনি সমাজে অব্যবহার্য্যরূপে গণ্য হবেন।"

ব্যবস্থা শুনিয়া সকলেই বজ্রাহতবৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। নরেন তীব্র ভ্রূকুটীপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইল না। ক্ষণকাল পরে শিরোমণি নিজেই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্ত কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, "নরেন!"

চমকিত হইয়া নরেন মুখ তুলিয়া চাহিল। শিরোমণি বলিলেন, "এতক্ষণ আমি তোমার ব্যবস্থাদাতা ছিলাম। এখন আমি তোমার আত্মীয়, শ্বশুর। আমার পরামর্শ শুনবে?"

পুনরায় মাথা নীচু করিয়া গম্ভীরস্বরে নরেন বলিল, "পরামর্শটা না শুনলে সে কথা স্বীকার কত্তে পারি না।"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "বেশ। শোন, সমাজের কাছে অহঙ্কারের আধিপত্য চলবে না; তুমি যেই হও, সমাজের কাছে তোমাকে মাথা নীচু কত্তে হবে। তোমার নিজের জন্য না হয়, অন্ততঃ সমাজের মঙ্গলের জন্যও তোমাকে সে হীনতাটুকু স্বীকার কত্তে হবে। নতুবা সমাজ শাসন থাকবে না, সমাজ শাসন না থাকলে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা বা শান্তিও রক্ষিত হবে না। বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারের মধ্যে মানুষ বাস কত্তে পারে না। তুমি একটা সাধারণ লোক হ'লে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু তুমি দেশের জমিদার। এখন বিধর্ম্মী রাজা, নতুবা জমিদারই দেশের শান্তিরক্ষক, সমাজের কর্ত্তা। তুমি যদি সমাজকে অবজ্ঞা কর, তবে তোমার দৃষ্টান্তে অপর পাঁচ জনেও সেইরূপ কত্তে পারে।"

নরেন একটু ভাবিয়া বলিল, "আমাকে কি কত্তে বলেন?"

শিরোমণি বলিলেন, "ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার উচিত। যদিও ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা হীনধর্ম্ম নয়, এবং তাদের হাতে খেলে জাতিধর্ম্ম লোপের কোনই সম্ভাবনা নাই, তথাপি সমাজের

অনুরোধে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত কত্তেই হবে। রাজগঞ্জের নবদ্বীপ স্মৃতিরত্ন স্মৃতিশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত। তাঁর কাছে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে এস। সেখানে বোধ হয় যেতেও হবে না, কিঞ্চিৎ প্রণামী দিলে তিনি নিজেই এসে ব্যবস্থা দিয়ে যাবেন। মনের ভিতর যাই থাক্, কিন্তু এমন কাজ আর করবে না বাইরে এই ভাব দেখিয়ে তাঁর কাছ হ'তে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে নরেন বলিল, "আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হ'য়ে আমাকে কপটতা অবলম্বনের উপদেশ দিচ্চেন ?"

শিরোমণি হাসিয়া উঠিলেন ; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সংসারে কপটতা কোন্ খানটায় নাই নরেন ? উঠতে বসতে, হাসতে কাঁদতে প্রতিপদে কপটতা। বুকের ভিতর দুঃখের আগুন জ্বলছে, কিন্তু মুখে হাসিটুকু ফুটিয়ে তুলতে হচ্চে। মনের ভিতর বিষয়বাসনা মাথা ঠেলে উঠছে, কিন্তু তাকে চেপে রেখে মুখে বলতে হচ্চে, হে ঠাকুর, আমি কিছুই চাই না, চাই তোমাকে। কপটতার আবরণেই সংসারটা ঢাকা যে নরেন।"

নরেন স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শিরোমণি বলিতে লাগিলেন, "এই যে তুমি সমাজের উপর এতটা ঘৃণা প্রকাশ কচ্চো, এটাও তোমার কপটতা নয় কি ? বাস্তবিকই কি তুমি হিন্দু-সমাজকে এতটা ঘৃণা কর ? কখনই না। এ সমাজ যতই রুগ্ন অক্ষম হোক, যতই অসার বা নিন্দনীয় হোক, এর উপর তোমার আন্তরিক টান অবশ্যই আছে। নতুবা নিশ্চয়ই তুমি এতদিন অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ কত্তে।"

বলিয়া শিরোমণি নরেনের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিলেন।

নরেনের মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মুখে প্রকাশ না করিলেও মনে মনে এই অন্তর্দর্শী উদারচিত্ত পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

অতঃপর শিরোমণি মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া নরেন প্রস্থান করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। সায়ংসন্ধ্যা সমাপন জন্য শিরোমণি মহাশয় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"অপর্ণা !"

"কেন বাবা ?"

"আজ নরেন এসেছিল।"

অপর্ণা মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। শিরোমণি বলিলেন, "অন্য কোন কাজে নয়, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে এসেছিল।"

ঈষৎ কৌতূহলের সহিত অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত বাবা ?"

শিরোমণি বলিলেন, "সে নাকি কলকাতায় ব্রহ্মজ্ঞানীদের ঘরে খেয়েছিল। সেই কথা কে এখানে প্রচার ক'রে দিয়েছে।"

একটু কর্কশ কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "যেই বলুক, সে কিন্তু মিথ্যা বলে নি।"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "নরেনও সে কথা অস্বীকার কচ্চে না।"

অপ। অস্বীকার করলে চলবে কেন ?

শিরো। না চলবারও কোন হেতু নাই। ও যে সেখানে খেয়েছিল, তা কে দেখেছে ? দেখলেও জমিদারের বিরুদ্ধে সে কথা প্রমাণ কত্তে কে সাহসী হবে ?

বলিয়া শিরোমণি কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। অপর্ণা খুঁটীটা ধরিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদুহাস্য সহকারে শিরোমণি বলিলেন, "নরেন কিন্তু ভুবন বাবুর ছেলে; নিজের দোষ গোপন কত্তে জানে না।"

তীব্রকণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "অনেক লোক অন্যায় কাজকে বাহাদুরীর কাজ ব'লে জোর গলায় সেটা প্রকাশ ক'রে বেড়ায়।"

শিরোমণি বলিলেন, "নরেন কিন্তু এটাকে আদৌ অন্যায় ব'লে মনে করে না, অপি।"

তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া অপর্ণা বলিল, "সেটাও একটা বাহাদুরী।"

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে শিরোমণি বলিলেন, "বাহাদুরী নয় অপি, ন্যায় ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে বিচার কত্তে গেলে বাস্তবিকই এটা অন্যায় কাজ নয়। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মেলা মেশা করলে বা তাদের হাতে খেলে বাস্তবিক জাতি বা ধর্ম্ম যায় না।"

বিস্ময়ের সহিত অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "জাতি যায় না? ওরা তো খিরিষ্টান?"

শিরোমণি হাসিয়া বলিলেন, "খিরিষ্টান নয় অপি, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা উচ্চ অঙ্গ। সুতরাং ওদের সংস্পর্শে জাতিনাশের কোনই আশঙ্কা নাই।"

অপ। তবে ওরা হিন্দুধর্ম্ম হ'তে পৃথক হ'য়ে আছে কি জন্য?

শিরো। ওঁরা প্রতিমাপূজা স্বীকার করেন না।

অপ। তার মানে, আমাদের ঠাকুর দেবতাকে মানে না এই তো?

শিরো। কিন্তু আমাদের মধ্যেও যাঁরা অদ্বৈতবাদী, তাঁরাও তো ঠাকুর দেবতা মানেন না?

অপ। ওদের ভিতর জাতি বিচার নাই।

শিরো। আমাদের ভিতরে যাঁরা সন্ন্যাসী পরমহংস, তাঁরাও জাতি-বিচার করেন না। অথচ তাঁদের উচ্ছিষ্টের একটী কণা পেলে আমরা আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করি।

অপ। তাঁরা সাধুপুরুষ।

শিরো। ব্রাহ্মদের ভিতরেও এমন সব সাধুপুরুষ জন্মেছিলেন, এখনো এমন মহাপুরুষ আছেন, যাঁদের পায়ের ধূলা নিলেও আমরা পবিত্র হ'য়ে যাই।

ব্রহ্মজ্ঞানীদের উপর পিতার এই শ্রদ্ধার আতিশয্য দর্শনে অপর্ণা শুধু আশ্চর্য্যান্বিত হইল না, মনে মনে অনেকটা রাগিয়া উঠিল। সে ঈষৎ রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি যাই বল বাবা, কিন্তু যাদের মেয়েগুলা জুতো শেমিজ প'রে, পুরুষদের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আমি কিছুতেই ভাল বলতে পারি না।"

শিরোমণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেটা ওরা ইংরাজদের চাল চলনের অনুকরণ করেছে। কিন্তু সে বাহ্য চালচলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই অপি।"

গ্রীবা আন্দোলন করিয়া অপর্ণা বলিল, "তোমার বাবা ঐ একরকম ক্লি, যেন নাস্তিকের মত কথা। যা তা খেলে, যার তার সঙ্গে মিশলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না?"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "ধর্ম্ম জিনিষটা এমন ভঙ্গুর নয় অপি, যে এত সহজে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। আমাদের দেশের এক মহাপুরুষ এই গুলার কি নাম দিয়ে গিয়েছেন জানিস্, ছুৎমার্গ। তিনি বলেন, এ দেশের লোক ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়ে শুধু ছুৎমার্গ নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।"

অপর্ণা বলিল, "কিন্তু এই ছুৎমার্গ তো চার যুগ চলে আসছে। তাই শাস্ত্রেও এগুলাকে অধর্ম্ম ব'লে তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছে?"

শিরোমণি বলিলেন, "সে প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্মরক্ষার জন্য নয়, সমাজরক্ষার জন্য। সকলে স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠলে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না, কাজেই এই শাসনের বিধান কত্তে হ'য়েছে।"

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, "যে কারণেই হোক বাবা, প্রায়শ্চিত্ত করা তো দরকার ?"

শিরোমণি বলিলেন, "তা দরকার বই কি। কিন্তু কালধর্ম্মে সে প্রায়শ্চিত্তের কঠোরতাটাও এমনি শিথিল হ'য়ে এসেছে যে, সেটা কারো পক্ষে ভীতিজনক না হ'য়ে শুধু একটা হাস্যজনক অভিনয় মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র, সান্তপন, চান্দ্রায়ণের পরিবর্ত্তে কাহণ কতক কড়ি উৎসর্গ করলেই যখন শুদ্ধ হওয়া যায়, তখন সে প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে কারো অবৈধ আচরণে ভীত হ'বার কথা নয়।"

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। শিরোমণি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু তোকে তো এবার যেতে হচ্চে অপি।"

"না গেলে কি চলে না ?"

"না।"

অপর্ণা নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শিরোমণি মৃদুগম্ভীর আদেশের স্বরে বলিলেন, "না মা, তোকে যেতেই হবে।"

অপর্ণা নত মুখে মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি যদি যেতে বল বাবা, তা হ'লে আমাকে যেতেই হবে।"

শিরোমণি একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাকে যে বলতেই হবে মা ; না বলবার উপায় নাই।"

অপর্ণা দাঁড়াইয়া নখ দিয়া খুঁটী আঁচড়াইতে লাগিল।

শিরোমণি বলিলেন, "এমনটা যে হবে তা আমি আগেই বুঝেছিলাম

অপি, কিন্তু ভুবন বাবুর অনুরোধ এড়াবার শক্তি আমার ছিল না, কাজেই আমাকে এই অসমান কুটুম্বিতায় সম্মতি দিতে হ'য়েছিল।"

অতীতের স্মৃতিতে শিরোমণি মহাশয়ের মুখখানা গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তোকে একটা কথা ব'লে দিই অপি, স্বামী সকল অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজ্য। স্বামী রুগ্ন হোক, অক্ষম হোক, দুর্ব্বল হোক, অশুচি হোক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর অভক্তির পাত্র হ'তে পারে না।"

অপ। অন্যায় কাজ করলেও না?

শিরো। যেখানে প্রকৃত ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে প্রকৃত স্নেহ মমতা থাকে, সেখানে তো ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা থাকে না অপি। অন্যায়টা ধরা পড়ে সেখানে, যেখানে হৃদয়ের প্রকৃত আকর্ষণ নাই। তা ছাড়া যে আপনার জন, অন্যায় দেখে তাকে দূরে রাখলে তো চলে না, বরং অন্যায় হ'তে দূরে রাখবার জন্য তাকে আরো কাছে টেনে আনতে হয়।

অপর্ণা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে পিতার এই সকল কথা অপূর্ব্ব গুরূপদেশের ন্যায় শুনিতে লাগিল। শিরোমণি একটু থামিয়া বলিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, স্বামীর ধর্ম্মই তার ধর্ম্ম, স্বামিসেবাই তার একমাত্র কার্য্য।"

অপর্ণা বলিল, "তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও বাবা, স্বামী ঘোরতর অধার্ম্মিক হ'লেও, স্ত্রীর উপর অন্যায় অত্যাচার করলেও তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে?"

সহাস্যে শিরোমণি বলিলেন, "শাস্ত্রের তো তাই আদেশ অপি। আর কেবল শাস্ত্রের আদেশ কেন, রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে বনবাসে

দিয়েছিলেন, তখন সীতাদেবী অনাচারী স্বামীর উদ্দেশে কি কথা বলে-ছিলেন তা পড়েছিস্ তো ?"

অপর্ণা বলিল, "কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে ততটা সহিষ্ণুতা কি সম্ভব বাবা ?"

শিরোমণি বলিলেন, "অসম্ভবই বা কিসে মা, সীতাও তো এই রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই স্বামীর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার অকাতরে সহ্য ক'রে গিয়েছেন।"

অপর্ণা বলিল, "কিন্তু সেটা কিসে সম্ভব হয় বাবা, বুঝে উঠতে পারি না।

ঈষৎ হাসিয়া শিরোমণি বলিলেন, "সাধনার দ্বারা। সাধনায় অহঙ্কারটুকু দূর করতে পারলেই এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়।"

মুখ তুলিয়া স্ফীতকণ্ঠে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু অহঙ্কারই যদি গেল, তবে জীবনের আর রইল কি ?"

কন্যার মুখের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শিরোমণি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সকলই রইলো অপি। আত্মাভিমান বর্জ্জন ক'রে পরের সত্তায় নিজের সত্তা মিশিয়ে দেওয়া, এইখানেই তো জীবনের সার্থকতা। ওরই নাম মুক্তি, এরই নাম আনন্দ; জীবনের সুখ বা তৃপ্তি যা কিছু তা এরি মধ্যে আছে যে অপি। এই সুখ পাবার জন্যই মানুষ জন্মজন্মান্তর ধ'রে তপস্যা করে, যোগী পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মাকে মিশিয়ে দিতে চায়, ভক্ত আরাধ্য দেবতার চরণে আপনাকে সমর্পণ করে।"

শিরোমণি কন্যার দিক হইতে ফিরিয়া আপনার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি নক্ষত্র-মালা বিভূষিত অনন্ত নীলাকাশে স্থাপিত করিলেন; অপর্ণা স্তব্ধ নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন ব্যবস্থা লইতে আসিবার পূর্ব্বেই মহামায়ার প্রেরিত লোক আসিয়া অপর্ণাকে লইয়া যাইবার সংবাদ দিয়া গিয়াছিল। তখন অপর্ণার সেখানে যাইতে যে একেবারেই অনিচ্ছা ছিল তাহা নহে, বরং যাইবার জন্য একটু আগ্রহও হইয়াছিল। কিন্তু তারপর নরেন এখানে নিজে আসিল, অথচ বাড়ীর ভিতর আসিয়া একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার অবসরও তাহার হইল না, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সে একটা কথাও বলিয়া গেল না। দুই বৎসরে যে আগুনটা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিয়াছিল, সেই অভিমানের আগুনটা আবার ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; দুই বৎসর পূর্ব্বের সেই অপমানের বেদনাটা আবার যেন নূতন ক্ষতের ন্যায় অন্তরটাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল। তাহার স্বামিগৃহে যাইবার আগ্রহটুকু অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু পিতার উপদেশ ক্ষতে যেন শান্তিজনক মধুর প্রলেপ মাখাইয়া দিল; অভিমানের আগুনটা যেন নিবিয়া আসিল। পিতার আদেশের নিকট সে আপনার সকল মান অভিমানকে তুচ্ছ করিয়া লইয়া যেন পিতার আজ্ঞা পালনের জন্যই স্বামিগৃহে যাইবার নিমিত্ত হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া লইতে লাগিল।

পর দিন সকালে জমিদার বাড়ী হইতে মহামায়ার প্রেরিত শিবিকা আসিলে অপর্ণা পিতার পদধূলি লইয়া তাহাতে আরোহণ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বড় বাবুর শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। শ্রাদ্ধের পরও তাঁহার গোলমাল মিটিতে আরও কয়েকদিন লাগিল। ক্রমে নানাস্থান হইতে সমাগত আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রজাগণ একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। বিষম জনকোলাহল হইতে মুক্তি পাইয়া জমিদারভবনের সহিত গ্রাম-খানাও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। গোপীনাথ জমাখরচের খাতা লইয়া হিসাব নিকাশে প্রবৃত্ত হইল। তিন দিন অবিরত পরিশ্রমের পর সে যখন জমাখরচ মিলাইয়া খাতা ঠিক করিল, তখন ঘোষাল মহাশয় তাহার নিকট আসিয়া জানিয়া গেলেন, বড় বাবুর শ্রাদ্ধে পাঁচ হাজার সাতশত তেত্রিশ টাকা দশ আনা সাড়ে তিন পাই রোক খরচ হইয়াছে। খরচ শুনিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইল; অনেকে দীনু মুদীর দোকানে বসিয়া গণ্ডার দ্বারা টাকাটার পরিমাণ আপনাদের জ্ঞানগোচরে আনি-বার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গোলযোগ মিটিয়া গেলে নরেন কলিকাতা যাইতে উদ্যত হইল। তখন মহামায়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "এতদিন যা খুসী ক'রে বেড়িয়েছ ঠাকুর পো, কিন্তু এখন আর সে রকম চলবে না। এখন জমিদারীর ভার তোমার উপর, কাজকর্ম্ম সব বুঝে নাও।"

নরেন বলিল, "কিন্তু জমিদারীর কাজ আমার দ্বারা চলবে ব'লে বোধ হয় না বৌদি।"

মহামায়া বলিলেন, "তোমার দ্বারা না চললে আর কে চালাবে ঠাকুর পো? তোমার মাথার উপর আর কে আছে?"

মহামায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নরেন নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মহামায়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "আর পাগলামি ক'রো না ঠাকুর পো, বেটা ছেলে, লেখা পড়া জান, দিন কতক দেখা শোনা করলেই সব বুঝতে পারবে।"

চিন্তিতভাবে নরেন বলিল, "সত্যি বলছি বৌদি, এসব আমি পেরে উঠবো না।"

মহামায়া বলিলেন, "তা হ'লে কি হবে ?"

নরেন চুপ করিয়া রহিল। মহামায়া ঈষৎ রাগতভাবে বলিলেন "তুমি না দেখতে পার, পাঁচ ভূতে লুটে খাবে।"

নরেন নিরুত্তর। মহামায়া ক্রোধগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি থাকতে তা হবে না ঠাকুর পো। যে বিষয় তিনি বুক দিয়ে রক্ষা ক'রে গিয়েছেন, যার জন্য তিনি নিজের জীবনটা পর্য্যন্ত—"

আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে মহামায়া বলিতে লাগিলেন, "যে বিষয় রক্ষা কত্তে গিয়ে তিনি নিজের দেহপাত করেছেন, সে বিষয় আমি এমন ভাবে নষ্ট কত্তে দেব না। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি না দেখতে পার, আমি মেয়ে মানুষ, আমি নিজে দেখবো।"

বলিয়া মহামায়া ক্রোধভরে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। নরেন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার উপর রাগ করলে বৌদি ?"

মহামায়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রোষগম্ভীর মুখে বলিলেন, "তুমি কি মনে কর ঠাকুর পো, চিরকালটা তুমি অন্যের উপরেই রাগ অভিমান ক'রে কাটাবে, তোমার উপর কেউ রাগ করবে না ?"

নতমুখে নরেন উত্তর করিল, "কিন্তু এতটা রাগ দেখাবার মত আমি কিছু ক'রেছি কি ?"

গর্জ্জন করিয়া মহামায়া বলিলেন, "তুমি যা করেছ, তা অতি বড় শত্রুতেও করে না ঠাকুর পো। আজ তুমি বিষয় দেখতে পারবে না ব'লে সরে দাঁড়াচ্চো, কিন্তু একদিন এই বিষয় ভাগ ক'রে নেবার তরে কি কেলেঙ্কারীটাই না করেছ। তুমি মনে কচ্চো, বিষয়টা ছেড়ে দিয়ে গিয়ে তুমি খুব একটা মহত্ত্ব দেখিয়েছ, কিন্তু তা নয় ঠাকুর পো, তোমার সেই অস্বাভাবিক মহত্ত্বটুকুই যে তোমার দাদাকে অকাল-মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে সেটা বোধ হয় তুমি আদৌ বুঝতে পার না।"

নরেনের মাথাটা আরও নীচু হইয়া আসিল। মহামায়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তাঁর উপর তুমি কি স্বেচ্ছাচারই না দেখিয়েছ? ঠাকুর যাকে লক্ষ্মী ব'লে বরণ ক'রে ঘরে এনেছিলেন, তিনি যাকে ঠিক লক্ষ্মীর প্রাপ্য সম্মানই দিতেন, তাকে বাড়ীর বা'র ক'রে তুমি তাঁর কি অপমানটাই না করেছ। সে অপমান তিনি কি রকম মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করেছিলেন, তা শুধু তিনিই জানতেন, আমাকে পর্য্যন্ত জানতে দেন নি, ঠাকুর পো। দু'বছরের মধ্যে তিনি তোমার খোঁজ নিতে যান নাই, তোমার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যে তিনি কি মর্ম্মযাতনায় দগ্ধ হ'য়েছিলেন, সেটা অনুভব করবার ক্ষমতাও তোমার নাই। শুধু পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয় নি, তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতাই তাঁর বুকের সকল শক্তি সামর্থ্যকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছিল।"

মহামায়ার দুই চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। নরেন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মহামায়া ক্ষণকাল স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

নরেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া

বাহিরে গিয়া কাছারী ঘরে উপস্থিত হইল, এবং গোপীনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কাল খাতাপত্র দেখবার কথা কি বলছিলেন; সেগুলা নিয়ে আস্থন।"

গোপীনাথ বিস্ময়ের সহিত ছোটবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হিসাবের খাতাপত্র খুঁজিতে ব্যস্ত হইল।

সে দিন খাইতে আসিতে অনেকটা বেলা হইলে মহামায়ার জিজ্ঞাসার উত্তরে নরেন বলিল, "হাতের কাজ না সেরে তো খেতে আসতে পারি না।"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "একদিনেই যে কাজের লোক হ'য়ে উঠলে ঠাকুর পো; দশ বছরের ক্ষতি একদিনের চেষ্টায় পূরণ ক'রে দিতে চাও বুঝি?"

নরেন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমার তো তাই ইচ্ছা।"

নরেনের এই আকস্মিক উৎসাহ দেখিয়া শুধু মহামায়া নয়, কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইল। গোপীনাথ ছোটবাবুর এই চেষ্টাকে শুধু সাময়িক উত্তেজনা ভাবিয়া মনে মনে হাসিল। নরেন তাহাকে আদেশ দিল, "আমি প্রত্যেক কাগজ তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে চাই।"

তাহাই হইল; গোপীনাথ চিঠা, খতিয়ান, জমাবন্দী প্রভৃতি প্রত্যেক কাগজ আনিয়া উপস্থিত করিল। নরেন যে সেই স্তূপাকার হিসাবের কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল তাহা নহে, কিন্তু সে এমনই ভাব প্রকাশ করিল যে, সে যেন কর্ম্মচারীদের প্রত্যেক ভুলটী সাতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। হঠাৎ নরেন একদিন আদেশ দিল, জমিদারীর মধ্যে যত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর বা পীরোত্তর আছে, তাহার হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কর্ম্মচারীরা হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিল। যাহারা এই সকল সম্পত্তির মালিক, তাহারা প্রমাদ গণিল।

মহামায়া শুনিয়া সশঙ্কভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুর পো, তুমি নাকি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর, দেবতার দেবোত্তর সব কেড়ে নিচ্চ ?"

নরেন বলিল, "না, অনেকে ফাঁকি দিয়ে এই সব জমি ভোগ কচ্চে ; শুধু তাদেরই শাসন করবো।"

মহামায়া বলিল, "কিন্তু আসল আর ফাঁকি চিনবে কিসে ?"

নরেন হাসিয়া বলিল, "দলিল দেখে।"

মহামায়া একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু দোহাই ঠাকুরপো, শেষে যেন দেবতা ব্রাহ্মণের রোষে প'ড়ো না।"

নরেন হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে ভয় নাই বৌদি, কলিতে দেবতা নিদ্রাগত, আর ব্রাহ্মণও নির্ব্বিষ সাপ।"

দেবতা ব্রাহ্মণের উপর এই অবজ্ঞা দেখিয়া মহামায়া মনে মনে শঙ্কিত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রাদ্ধের সময় অপর্ণা আসিয়াছিল, কিন্তু নরেনের সহিত তাহার এপর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয় নাই। সাক্ষাৎ যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সাক্ষাতে কেহ কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহে নাই, সাক্ষাতে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় পরস্পর মুখ ফিরাইয়া লইত। উভয়েরই মুখে চোখে ঘৃণা ও ক্রোধের ভাব যেন ফুটিয়া উঠিত।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু নরেন যেমন বাহিরে বাহিরে কাটাইতেছিল তেমনই কাটাইতে লাগিল। মহামায়া ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন নরেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর পোর হঠাৎ গৃহবাসে এত অভক্তি হ'লো কেন?"

সহাস্যে নরেন উত্তর করিল, "অভক্তি হয় নি, ভয় হ'য়েছে।"

"ভয় কা'কে? ছোট বৌকে নাকি?"

"তাঁর শুচিত্বকে।"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "তুমি তো প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শুচি হ'য়েছ।"

নরেন বলিল, "আর সকলের কাছে শুচি হ'লেও তাঁর কাছে বোধ হয় অশুচিই আছি।"

মহামায়া বলিলেন, "এটা বোধ হয় তোমার অপবিত্র মনের নিজস্ব অনুমান মাত্র।"

নরেন বলিল, "না, ওঁর বাবারই বাবস্থা। ওঁর বাবাই ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমি প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য, প্রায়শ্চিত্ত করলেও আমার শুদ্ধি হবে না।"

সহাস্যে মহামায়া বলিলেন, "কিন্তু পুরুষের টোলের ব্যবস্থার সঙ্গে মেয়ে মানুষের টোলের ব্যবস্থার মিল নাই তা জান তো।"

নরেন উত্তর করিল, "কি জানি।"

মহামায়া বলিলেন, "তোমাকে জানতে হবে না, আমি জানি সে টোলের ব্যবস্থায় তুমি শুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছ।"

নরেন মৃদু হাসিয়া নীরবে রহিল। মহামায়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ ঠাকুর পো, এত দিন যা পাগলামী করবার তা করেছ, কিন্তু এখন আর ওরকম পাগলামী চলবে না। মানুষ ততক্ষণ স্বাধীন থাকে, যতক্ষণ না কর্ত্তৃত্বের ভার তার মাথায় পড়ে। সে ভার মাথায় পড়লে তখন তাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পাঁচ জনের ইচ্ছার বশীভূত হ'য়ে চলতে হয়।"

মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল, "এমন পরাধীনতার ভার আমি নিতে চাই না, বৌদি।"

মহামায়া বলিলেন, "মানুষ ইচ্ছা ক'রে ভার নেয় না ঠাকুর পো, সে ভার নিতান্ত অতর্কিতভাবে এসে তার ঘাড়ে চেপে বসে। তুমি কি এখন ইচ্ছা করলেই সে ভারটাকে ঝেড়ে ফেলতে পার?"

নরে। পারি না কি?

মহা। কক্ষনো পার না। সে চেষ্টা শুধু একটা অন্যায় জবরদস্তি হবে মাত্র।

নরে। যে জিনিষটা জোর জবরদস্তিতে আমার স্বাধীন ইচ্ছাটাকে মুষড়ে দিতে চায়, তার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য জবরদস্তি দেখান বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হবে না।

মহা। তাতে শুধু যে অন্যায় হবে তা নয়, আপনার দুর্ব্বলতাও স্পষ্ট

প্রকাশ পাবে। না ঠাকুর পো, কর্ত্তব্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব; মান অভিমানকে তার উপর আসন দিওনা।

নরেন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মহামায়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। শীতের সন্ধ্যা কুজ্ঝটিকার আবরণে বিষাদের গুরুভার লইয়া ধীরে ধীরে দিবসের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া দিতে লাগিল। নরেন চিন্তাক্লিষ্ট মুখে উঠিয়া বহির্গমনোদ্যত হইল।

দরজার কাছে আসিতেই সম্মুখে অপর্ণাকে দেখিয়া নরেন থমকিয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া গোধূলির যে শেষরশ্মিটুকু ঘরের ভিতর ম্লান আলোক ছড়াইয়া দিতেছিল, তাহারই কতকটা আলো অপর্ণার মুখের উপর পড়িয়া তাহার গম্ভীর মুখখানাকে অধিকতর গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছিল। নরেন একবার সেই দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। চকিতে তাহার মুখের উপর লজ্জার ঈষৎ রক্তিমা বিদ্যুতের মত চমকিত হইয়া গেল।

অপর্ণা কিন্তু দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল না, সঙ্কোচ বা লজ্জার ভাব একটুও প্রকাশ করিল না; সে নরেনের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমায় একটা কথা বল্‌তে এসেছি।"

নরেনও তেমনই গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আর কারো দ্বারা ব'লে পাঠালেও পারতে।"

তাহার ঠোঁটের পাশে একটু চাপা হাসি উছলিয়া উঠিল। অপর্ণার মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া আসিল; দৃষ্টি ঈষৎ নত করিয়া বলিল, "কথাটা ব'লেই আমি চলে যাচ্চি।"

নরেন বলিল, "তুমি যাও বা থাক তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই

নাই, তবে অপবিত্র পাপী লোকের সঙ্গে বাক্যালাপে অশুচি হ'তে পার।"

শ্লেষতীব্রকণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত যখন করেছ, তখন শুদ্ধ হ'য়েছ বোধ হয়।"

নরেন বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত একটা ক'রেছি বটে, কিন্তু আমার শুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; কেন না তোমার বাবার মতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

অপর্ণা বলিল, "আমার বাবার ব্যবস্থা খণ্ডন কত্তে পারে এমন পণ্ডিত দেশে নাই।"

তাচ্ছীল্যসূচক মুখভঙ্গী করিয়া নরেন বলিল, "সেই জন্যই বলছি, এত বড় পণ্ডিতের মেয়ে তুমি, একজন মূর্খ পাপীর সঙ্গে বাক্যালাপ করা তোমার উচিত নয়। তোমার বাবাও বোধ হয় তোমার এই অসঙ্গত কাজের অনুমোদন করবেন না।"

রুক্ষকণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "বাবার অনুমোদন অননুমোদনের উপর তুমি যে এতটা নির্ভর কত্তে পার তা জানতাম না।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "এত বড় একজন পণ্ডিতের মতামত উপেক্ষার জিনিষ নয়।"

ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করিয়া অপর্ণা বলিল, "তোমার হাতে কন্যা সম্প্রদান ক'রে বাবা অপরাধী হ'লেও তাঁর মত দেশমান্য পণ্ডিতকে উপহাস করা তোমার উচিত নয়।"

গম্ভীরভাবে নরেন বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ, তোমার বাবাকে আমি উপহাস করি না, শ্রদ্ধা করি।"

অপর্ণা একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল।

নরেন বলিল, "কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁর মত উদার পণ্ডিতের মেয়ে হ'য়ে মনের এতটা নীচতা তুমি কোথায় পেলে ?"

অপর্ণা ক্রুদ্ধভাবে মুখ ফিরাইয়া লইল। নরেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যাক্, এখন তোমার বক্তব্যটা কি শুনি।"

অপর্ণা একটু ইতস্তত: করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি নাকি দিদির কাছে বলেছ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নরেন বলিল, "কর না কি ?"

অপর্ণা তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি যে মিথ্যা বলেছি এমন কথা বোধ হয় তুমি বল্‌তে পারবে না।"

বলিয়া সে অপর্ণার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টিপাত করিল। অপর্ণা মুখ তুলিয়া অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে কথঞ্চিৎ দৃঢ়তা আনিয়া বলিল, "ঘৃণার কাজ না করলে কেউ ঘৃণা করে না, এটাও বোধ হয় অস্বীকার কর না।"

নরেন বলিল, "কিন্তু তোমার ঘৃণা বা শ্রদ্ধা দুইটাকেই সমানভাবে দেখি এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখচি।"

একটা অট্টহাস্যে ঘরখানাকে প্রতিধ্বনিত করিয়া নরেন বাহির হইয়া গেল। অপর্ণা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া নিশ্চল নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাবারের থালা হাতে মহামায়া আসিয়া ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, ঠাকুরপো বেরিয়ে গেল নাকি ছোট বৌ ?"

অপর্ণা উত্তর দিল, "হুঁ।"

মহামায়া তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রোষগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "তোকে না ব'লে দিলাম খাবার নিয়ে যাচ্চি। তুই ব'লেছিলি ?"

নতমুখে গম্ভীরস্বরে অপর্ণা উত্তর করিল, "না।"

তিরস্কার সূচক কঠোর দৃষ্টিতে অপর্ণাকে যেন বিদ্ধ করিয়া মহামায়া থালা লইয়া ফিরিয়া গেলেন। অপর্ণা আস্তে আস্তে দ্বার প্রান্ত ত্যাগ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া নরেন কাছারীতে উপস্থিত হইলে গোপীনাথ কতকগুলা কাগজপত্র আনিয়া সহি করিবার জন্য দিল। নরেন দুই চারিখানা কাগজে সহি করিয়াই বিরক্তভাবে কাগজগুলা ঠেলিয়া দিল, এবং গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রহ্মোত্তর জমিগুলার হিসাব কোথায়?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গোপীনাথ উত্তর করিল "হিসাবের কাগজপত্র তৈরী হচ্চে।"

ক্রুদ্ধস্বরে নরেন বলিল, "এখনো তৈরী হচ্চে? অকর্ম্মণ্য সব।"

বলিয়া সে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিল। গোপীনাথ হিসাবের কাগজগুলা গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "সহজে তো ঠিক হবে না ছোট বাবু, নূতন জরিপ কত্তে হবে। গঙ্গাপুরের নায়েবকে একজন ভাল আমিন পাঠাতে লিখে দিয়েছি।"

"মস্ত কাজ করেছ" বলিয়া নরেন উঠিয়া পড়িল, এবং কঠোর আদেশের স্বরে বলিল, "সাতদিনের মধ্যে কিন্তু আমি হিসাব চাই গোপীবাবু, নয় তো আমাকে নূতন লোকের চেষ্টা দেখতে হবে।"

বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। বৈঠকখানায় তখন কেহ ছিল না। চাকর আলো জ্বালিয়া জানালা দরজা সব বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিল। নরেন আলোটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একখানা বই লইয়া বসিল।

অনেকে মনে করেন, পুস্তকপাঠে মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। কিন্তু

মন চঞ্চল থাকিলে তাহাকে পুস্তকে নিবদ্ধ করাই যে কিরূপ দুরূহ, তাহা নরেন আজ বেশ বুঝিতে পারিল। পুস্তকের যে যে অংশ তাহার মনোনীত ছিল, যে সকল স্থান তাহার মিষ্ট বোধ হইত, সেই সকল স্থান বাহির করিয়া তাহাতে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা বৃথা হইল, ভাবগ্রহণ দূরের কথা, মুদ্রিত অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন মনের এক পাশ দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। বিরক্তভাবে নরেন বইখানা ফেলিয়া রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, এগুলা কি অলীক স্বপ্ন! কল্পনা ছাড়া বাস্তব জগতে কি উহাদের অস্তিত্ব নাই? অথবা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজ এগুলাকে আপনাদের গণ্ডীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে? এবং শ্রদ্ধাভক্তিকে ইহার স্থলে স্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে? কিন্তু ভক্তি, সে তো ভালবাসারই উচ্চস্তর, এবং এই পতিভক্তি ও পাতিব্রত্যের জন্য হিন্দুরমণী জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু অপর্ণার পতিভক্তি যদি তাহার আদর্শ হয়, তবে বলিতে হইবে, হিন্দু সমাজের সঙ্গে হিন্দু-রমণীর হৃদয়ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশে সাবিত্রী বনবাসী স্বল্পায়ু সত্যবানকে বরণ করিয়াছিল, সীতা পতিপরিত্যক্তা হইয়াও পতিধ্যানে তন্ময় হইয়াছিলেন, সেই দেশে শুচিত্বের অনুরোধে স্বামীর প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন ইহা হিন্দুরমণীর একটা আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন বটে।

কিন্তু জীবনে এ যে একটা মস্ত অভিশাপ। এই অপ্রিয়বাদিনী স্নেহসম্পর্কশূন্যা ভার্য্যা লইয়া যদি জীবনের সারা পথটা অতিক্রম করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা ভীষণতর দুঃখ আর যে কিছুই নাই। ঐ তো, তাহারই দীনদরিদ্র কত প্রজা অভাবের কঠোর তাড়নার মধ্যেও সাধ্বী পত্নীর স্নেহস্পর্শে সুশীতল ভগ্নকুটীরে কি পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিতেছে!

সে কতদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছে, শ্রীমন্ত মালিক মধ্যাহ্নের রৌদ্রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া ক্লান্ত ঘর্ম্মসিক্ত দেহে যখন ঘরে ফিরিয়াছে, তখন তাহার স্ত্রী সৈরবী কি আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া ছেঁড়া মাদুরখানি পাতিয়া দিয়াছে, তামাক সাজিয়া দিয়া নিজে পাখা ধরিয়া বাতাস করিয়াছে। তার পর মোটা মোটা রাশীকৃত ভাত মেটে পাথরে সাজাইয়া শ্রীমন্তের সম্মুখে ধরিয়া দিলে শ্রীমন্ত কি তৃপ্তি, কি প্রফুল্লতার সহিত তাহা উদরস্থ করিয়াছে। সেই এক সজিনা শাক মাত্র উপকরণদ্বারা মোটা মোটা শুক্না ভাতগুলাকে তেমন পরিতৃপ্তির সহিত উদরস্থ করিতে দেখিয়া নরেন কতদিন মনে মনে হাসিয়াছে, কিন্তু আজ সে বুঝিয়াছে, এই তৃপ্তি তাহার সেই বড় বড় ভাতের গ্রাসের মধ্যে ছিল না, তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা সৈরবীর মৃদুমধুর হাসিটুকুর মধ্যে ছিল। ঐ সবগুলি মোটা ভাত স্বামীকে খাওয়াইবার জন্য সৈরবী যে একটা প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, সেই আগ্রহটুকুই শ্রীমন্তের ঐ রসশূন্য স্বাদবিহীন সজিনা-শাকের মধ্যে সুধার আস্বাদ আনিয়া দিতেছিল।

আবার একদিন সামান্য ত্রুটীতে সৈরবীকে প্রহার করিতে দেখিয়া নরেন শ্রীমন্তের উপর ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সৈরবী খানিকটা কাঁদিয়াই যখন আবার প্রহারযাতনা বিস্মৃত হইয়া সাগ্রহে স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন সে সৈরবীর উপরেও না রাগিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু আজ সে বুঝিল, তাহার সে ক্রোধ সম্পূর্ণ ভ্রম। সৈরবী স্বামীর নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করিয়া যথার্থ নারীধর্ম্ম পালন করিয়াছিল। সে সংসারের সত্তায় আপনার সত্তা মিশাইয়া দিয়া যদি সহিষ্ণুতার সহিত নারীধর্ম্ম পালন করিতে না পারিত, তাহা হইলে সেই নিত্য অভাব-পীড়িত সংসারে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিত,

তাহাতে কোন্ দিন এই দুইটী প্রাণী পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। কিন্তু শুধু এই একটী রমণী আপনার স্নেহ ও সহিষ্ণুতার আবরণ দিয়া সংসারটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভিতরের উত্তাপটুকু আপনি ছাড়া আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিতেছে না।

হায়, অপর্ণার সহিত এই রমণীর কত প্রভেদ! শত অভাব উৎপীড়নের মধ্যে পড়িয়াও সে যে ধৈর্য্যবলে স্বীয় নারীধর্ম্মের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়াও অপর্ণা সে গৌরব হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা!

কিন্তু এ বিড়ম্বনা শুধু অপর্ণাকেই ভোগ করিতে হইতেছে না, ইহা তাহারও সুখশান্তির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার জীবনটাকে পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। হায়, এই নিষ্ফল বিড়ম্বিত জীবন লইয়া সে সংসারের কোন্ কাজ করিতে পারে?

ক্রোধে ক্ষোভে নরেনের ললাট কুঞ্চিত হইল। শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ মনে পড়িল, কয়দিন হইতে ললিতাকে পত্র লেখা হয় নাই। আজ ভূপীদার পত্র আসিয়াছে, তাহারও জবাব দিতে হইবে। নরেন ব্যস্তভাবে উঠিয়া টেবিলের পাশে আসিয়া বসিল, এবং কাগজ কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

প্রথমেই ললিতাকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুই তিন ছত্র লিখিবার পরই ভাবিয়া পাইল না, ইহার পর কি লিখিবে। আপনার বর্ত্তমান অবস্থাটা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে? ব্যর্থ জীবনের করুণ কাহিনীটা স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া জানাইবে? জানাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? লাভের মধ্যে অপর্ণাকে তাহার সমক্ষে দোষী

করিতে গিয়া আপনিও এত ছোট হইয়া পড়িবে যে, আর কোন দিনই সে ললিতার সম্মুখে মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। সে যে হিন্দু সমাজের গর্ব্ব লইয়া চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের উপর বিদ্রূপের কশাঘাত দিয়া আসিয়াছে, সেই আঘাতটা তাহারই পিঠে আসিয়া পড়িবে মাত্র।

কাগজ কলম ঠেলিয়া রাখিয়া নরেন উঠিয়া পড়িল, এবং বৈঠকখানার বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিল।

দেখিতে গেলে থাকিয়া কেবল ভিতরে নয়, বাহিরেও নরেন কতকগুলা অভাব অনুভব করিতেছিল। তাহার মধ্যে সঙ্গীর অভাবই প্রধান। অপরিণতবুদ্ধি জমিদার-তনয়ের সঙ্গীর অভাব হয় না, যুবা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনেকেই আসিয়া তাহার সহচরের স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নরেনের সহচরের স্থানটা সম্পূর্ণ শূন্য হইয়াই ছিল। কেননা এই সকল চাটুভাষী সহচরের সান্নিধ্য সে আদৌ সহ্য করিতে পারিত না। অধিকন্তু তাহার রুক্ষ প্রকৃতি, ধূমপানে পর্য্যন্ত অনাসক্তি প্রভৃতি দর্শনে জমিদারপুত্রের অযোগ্য বিলাস-ব্যসনশূন্য এই যুবকের দিকে ঘেঁষিতেও কেহ সাহস করিত না। ইহার ফলে নরেনকে প্রায় সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় যাপন করিতে হইত। কাছারীতে গেলে শুধু কর্ম্মচারীদের কাজ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান, আর বাড়ীর বাহির হইলে লোকের সম্ভ্রমপূর্ণ সেলাম ও নমস্কারে তাহাকে বিরক্ত হইয়া উঠিতে হইত। সময়ে সময়ে বিরক্তিটা এমনই প্রবল হইয়া উঠিত যে, নরেনের ইচ্ছা হইত, জমিদারী, কাজকর্ম্ম, সব ফেলিয়া সে কলিকাতায় ছুটিয়া পলায়। কিন্তু বৌদিদির ম্লান মুখের দুশ্ছেদ্য আকর্ষণটাকে সে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিত না।

আজ কিন্তু অন্ধকার বারান্দায় বেঞ্চির উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া

সঙ্কল্প করিল, এবার সে এই আকর্ষণ ছিন্ন করিবে, কালই সে বৌদিদির সকল-অনুরোধ উপরোধকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও কলিকাতায় পলাইবে।

সঙ্কল্প স্থির হইলে নরেন আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"ছোট বৌ!"

"কেন দিদি?"

"সত্যি বলবি?"

"তোমার কাছে তো কখনো মিছে বলি না।"

"কিন্তু আজ বোধ হয় প্রথম মিছে বলবি।"

বলিয়া মহামায়া একটু হাসিলেন। অপর্ণা জোরে মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "কক্ষণো না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ঠাকুর পো কি তোকে ভালবাসে না?"

বলিয়া তিনি অপর্ণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অপর্ণা মাথা নীচু করিয়া হাতের চুড়ীটা খুঁটিতে লাগিল। মহামায়া এবার একটু জোর গলায় বলিলেন, "উত্তর দে।"

অপর্ণা মুখটা আরও একটু নীচু করিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "আমি জানি না।"

মহামায়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া তর্জ্জন সহকারে বলিলেন, "তাই না আমার কাছে মিছে বলবি না?"

অপর্ণা এবার লজ্জারক্তিম মুখখানা তুলিয়া একটু চড়া গলায় বলিল, "অপর কেউ ভালবাসে কি না তা আমি কেমন ক'রে জানবো।"

মহামায়া এবার হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "তুই আমাকে হাসালি

ছোট বৌ, স্বামী ভালবাসে কি না এটা জানতে স্ত্রীকে কি আবার গণৎকার ডাকতে হয়? আমিও না মেয়ে মানুষ?"

অপর্ণা নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। মহামায়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমিও মেয়েমানুষ, তুইও মেয়েমানুষ, কিন্তু ধন্যি মেয়েমানুষ তুই ছোট বৌ। তোর মত স্বামীকে দূরে রাখতে কোন মেয়ে মানুষেই বোধ হয় পারে না।"

মুখ ভারী করিয়া অপর্ণা বলিল, "তা হোক, এত অনাচার অবি-চার আমি সইতে পারি না।"

ক্রুদ্ধ স্বরে মহামায়া বলিলেন, "তাই বুঝি আচার অনাচারের কাছে নিজের ধর্ম্মটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস্।"

অপর্ণা কোন উত্তর দিল না। মহামায়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এক জন বামুন পণ্ডিতের সঙ্গে বিয়ে হ'লে ভাল হ'তো, না?"

মৃদুস্বরে অপর্ণা উত্তর করিল, "বোধ হয়।"

তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া মহামায়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মহামায়া ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "কিন্তু তার তো আর কোন উপায় নাই, ছোট বৌ?"

অপর্ণা পরুষ কণ্ঠে উত্তর দিল, "সুতরাং সে কথার উল্লেখ বৃথা।"

মহামায়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু ছোট বৌ, মেয়েমানুষের গর্ব্বই বল, আচার বিচারই বল, ধর্ম্মই বল, সকলেরই একটা সীমা আছে। আর সে সীমা হ'লো স্বামী।"

অপর্ণা বলিল, "স্বামী যদি অধর্ম্ম করে, তবে স্ত্রীকেও অধর্ম্ম কত্তে হবে না কি?"

বলিয়া সে একটু উপহাসের হাসি হাসিল। মহামায়া ধীর শান্ত স্বরে বলিলেন, "অধর্ম্ম ক'রবার অধিকার কারো নাই। কিন্তু অধার্ম্মিক স্বামীকে ঘৃণা ক'রবারও অধিকার স্ত্রীর নাই। কেন না স্ত্রীলোকের সেইটাই সব চেয়ে অধর্ম্ম।"

অপর্ণা মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কোলের উপর রামায়ণখানা খোলা পড়িয়াছিল; নিঃশব্দে অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন, "পাতা ওল্‌টাচ্চিস্ কেন, পড়্ না।"

অপর্ণা পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানটা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল—

"শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
নিজ নারী রাখিতে যে ভয় করে মনে।
তারে বীর বলে নাকো কোন ধীর জনে॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্গ কিম্বা গৃহ নহে তার সমতুল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি ভ্রমিয়া কানন।
শ্যামরূপ নিরখিয়া করিব বারণ॥"

অপর্ণার স্বরটা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। মহামায়া অশ্রুজলে নেত্র

মার্জনা করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এমনি জিনিষই বটে! পৃথিবীতে এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নাই।"

তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল। সে উষ্ণ শ্বাসটুকু বায়ুসাগরে বিলীন না হইতেই নরেন আসিয়া ডাকিল, "বৌদি!"

অপর্ণা মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কাল আমি কলকাতায় যাচ্চি।"

বিস্ময় সহকারে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে কাল? কেন ঠাকুর পো?"

নরেন তীব্রকণ্ঠে বলিল, "এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাল লাগে না ঠাকুরপো?"

নরেন গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "এ কেন'র উত্তর আমি দিতে পারবো না, বৌদি!"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "আমি কিন্তু উত্তর দিতে পারি।"

বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া নরেন বলিল, "আমি সে উত্তর শুনতে চাই না।"

বলিয়া নরেন প্রস্থানোদ্যত হইল। মহামায়া ডাকিয়া বলিলেন, "শোন ঠাকুর পো।"

নরেন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া বলিলেন, "তুমি গেলে জমিদারী দেখবে কে?"

ভ্রূকুটি করিয়া নরেন বলিল, "যাদের জমিদারী তারা দেখবে।"

"তোমার কি নয়?"

"এ কথার নিষ্পত্তি অনেক আগেই হ'য়ে গিয়েছে।"

বলিয়া নরেন জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতর আলোটা মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। সে আলোকে ঘরের ভিতরকার কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। সেই অনুজ্জ্বল আলোকে অন্যমনস্কভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নরেন একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল।

না না, সে নিশ্চয়ই যাইবে। কোন কারণেই তাহার সঙ্কল্প বিচ্যুত হইবে না। কেনই বা হইবে? এখানে তাহার কি আছে? কোন্ আশায় সে এই অরণ্যপ্রায় স্থানে পড়িয়া থাকিবে? জমিদারীর মোহ, প্রভুত্বের মোহ, কিছুই তো তাহার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিতে পারিতেছে না। দিতেছে শুধু অশান্তি, শুধু বিরক্তি। এই বিরক্তির হাত হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাহাকে পলাইতেই হইবে। বৌদি রাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার রাগের জন্য সে তো এমন করিয়া অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতে পারেনা।

কিন্তু কলিকাতায় গিয়াই সে কি করিবে? পড়া তো অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছে। চাকরী—অভাবের জন্যই লোকে পরের দাসত্ব স্বীকার করে, বিনা প্রয়োজনে সে যে তাহা স্বীকার করিতে পারিবে ইহাও বোধ হয় না। তবে কি জন্য সে কলিকাতায় যাইবে? সেখানেই তাহার কে আছে? ললিতা—কিন্তু তাহার সহিত কি সম্বন্ধ? তাহারা ব্রাহ্ম, সে হিন্দু। শুধু ধর্ম্মান্তরের প্রভেদটাই একটা অন্তরায় নয়, সে বিবাহিত, ললিতা কুমারী। এ অবস্থায় ললিতার কাছে তাহার কি প্রত্যাশা থাকিতে পারে? ললিতার জন্য সে হয়তো ধর্ম্মত্যাগ

করিতে পারে, কিন্তু বিবাহিত জীবনটাকে ফিরাইয়া কৌমার্য্যে উপনীত করিতে পারে না। অপর্ণাকে ত্যাগ করিলেও ললিতা যে তাহাকে গ্রহণ করিবে এমন সম্ভাবনাও নাই, তাহাতে শুধু পত্নীত্যাগী বলিয়া ললিতার ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইতে হইবে। সেটা যে আরও বিড়ম্বনা।

কিন্তু ললিতা ঘৃণা না করিলেও সে কি বাস্তবিকই অপর্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে? কেনই বা পারিবে? এখনই বা কোন্ তাহাকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিয়াছে? যাহার সহিত সে একটা কথা কহিতেও অনিচ্ছুক, এ পর্য্যন্ত যাহাকে সে স্ত্রীর কোন অধিকারই দিতে পারে নাই, তাহাকে আর নূতন করিয়া কি ত্যাগ করিতে হইবে! যাহার গ্রহণ হয় নাই, সে বস্তু তো ত্যক্ত হইয়াই রহিয়াছে। সুতরাং ত্যক্ত বস্তুর ত্যাগে ক্ষতিবৃদ্ধি কি আছে?

ক্ষতি না থাক্, লাভও কিছু নাই। ত্যাগের সার্থকতা সেইখানে, যেখানে ত্যাগের মধ্য দিয়া আপনাকে লাভের দিকে অগ্রসর করা যায়। কিন্তু এ ত্যাগটা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক; ইহাতে জীবনটা সকল দিক্ দিয়াই নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। নরেনের ক্ষুব্ধ অন্তর ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল। চেয়ারের উপর হেলান দিয়া সে নিমীলিত নেত্রে পড়িয়া রহিল। অনুজ্জ্বল আলোকরশ্মি ক্ষীণ প্রভা বিস্তার করিয়া গৃহমধ্যে একটা বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাতে একটা চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়া নরেন চমকিয়া উঠিল। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই সচকিতে দেখিল, দ্বারপ্রান্তে ঠিক একটা ছায়া-মূর্ত্তির মত অপর্ণা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নরেন সেই দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ গাঢ়স্বরে ডাকিল, "অপর্ণা!"

যেন বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে অপর্ণার সর্ব্বশরীর থর থর কাঁপিয়া উঠিল। সে দুই হাতে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার রক্তহীন মুখমণ্ডলে উদ্বেগের যে চাঞ্চল্য ক্রীড়া করিতেছিল, অনুজ্জ্বল আলোকে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নরেন স্থির গম্ভীরস্বরে বলিল, "কাল আমি কলকাতায় যাচ্চি।"

অপর্ণা নিরুত্তর। নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

মৃদু কম্পিত কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "আছে।"

নরেন বলিল, "কি আছে বলতে পার।"

অপর্ণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কেন তুমি যাচ্চো?"

চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া নরেন বলিল, "এখানে থাকতে আমার ভাল লাগচে না।"

অপর্ণা মুখ তুলিয়া একটু জোর গলায় বলিল, "সেখানে ভাল লাগবে?"

"বোধ হয়।"

"ভাল লাগবার কি আছে?"

"এ কথার উত্তর দিতে পারবো না।"

"দিতে পার, কিন্তু দেবে না।"

নরেন নীরবে বসিয়া মেঝের উপর গোড়ালি ঠুকিতে লাগিল। অপর্ণা ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কিন্তু উত্তর দিতে পারি।"

"কি উত্তর?"

"সেখানে ললিতা আছে, তাই ভাল লাগবে।"

"ভ্রূকুটি করিয়া নরেন বলিল, "থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তোমার কি ?"

"কিছুই না।"

"তবে এত কথা বলচো কেন ?"

"বলতে কি নাই ?"

"তোমার পক্ষে নাই।"

বলিয়া ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গী করিল। অপর্ণা ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"ললি !"

জানালার পাশে বসিয়া অপরাহ্নের ম্লান আলোকে ললিতা একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল ; জ্যেষ্ঠের আহ্বানে দরজার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ভূপেন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একখানা চিঠী দেখাইয়া বলিল, "অনেক দিনের পর নরেন চিঠী দিয়েছে।"

ললিতা একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছেন ? ভাল আছেন তো ?"

ভূপেন বলিল, "লিখেছে অনেক কথা। তবে কি যে মাথামুণ্ড লিখেছে, আমি তো বুঝতেই পাচ্চি না। তুই যদি বুঝতে পারিস্ তো দেখ্।"

বলিয়া ভূপেন পাশের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া খামের ভিতর হইতে চিঠীখানা বাহির করিল। ললিতা বলিল, "তুমি বুঝতে পারনি দাদা, আর আমি বুঝতে পারবো।"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "বোধ হয় পারবি। কেননা তারও যেমন কবিত্বের ধাত, তোরও কতকটা তাই। কাজেই তুই বুঝলেও বুঝতে পারিস্।"

বলিয়া ভূপেন পত্রখানা পড়িতে লাগিল—

"ভূপীদা, তোমার তিন চারখানা চিঠী পেয়েছি, কিন্তু তার একখানারও উত্তর দেওয়া হয় নি। মনে ক'রো না কাজের ঝঞ্ঝাটে তোমাকে চিঠী লিখিবার সময় পাই না। সময় এত পাই যে সেটাকে

কাটাবার মত কাজই খুঁজে পাই না। কাজ যে একেবারেই নাই তা নয়, কিন্তু সে সব কি রকম কাজ জান? কোথায় কোন্ প্রজা খাজনা দেয় না, কি ভাবে মোকদ্দমা সাজালে অবাধ্য প্রজাটা পথে দাঁড়াতে পারে, কার সাতপুরুষের অধিকারভুক্ত তিনকাঠা জমি অধিকার কত্তে পারলে জমিদারীর আয় বেড়ে যায়, এই সকলের তত্ত্বাবধান খুব একটা বড় কাজ। তা ছাড়া কে কোথায় খেতে পায় না, তার উপায় ক'রে দাও, কার কন্যাদায় উপস্থিত কিছু সাহায্য কর, কোথায় কে স্কুল চালিয়ে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা কচ্চে, তাতে কিছু চাঁদা দাও, এমন সব কাজও অনেক আছে। এই সব কাজের ভিতর দিয়ে নামটাকে খুব জাহির করাও যায়, কিন্তু দিন কাটান যায় না। কাজেই সময়ের তুলনায় কাজটা খুবই কম।

কাজ না থাকলেও তোমাকে চিঠী লেখা হয় নি। লিখবার মত কিছু থাকে না ব'লেই লেখা হয় নি, সময়ের অভাবে নয়।

আচ্ছা ভূপীদা, জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় সমস্যা কোন্‌টা বল দেখি? তুমি হয় তো দর্শনের গভীর তত্ত্ব উপস্থিত ক'রে বলবে—জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ। কিন্তু সংগ্রামটা কিসের জন্য বুঝিয়ে দিতে পার? আমার বৈঠকখানার সামনে বকুল গাছে ব'সে ঐ যে পাখীগুলা রোজ নূতন নূতন সুরে গান গেয়ে যাচ্চে, ওদের জীবনের ভিতর তো কোনই সংগ্রাম দেখতে পাই না। ঐ যে ফুলগুলা সন্ধ্যায় ফুটে, সকালে ঝরে যায়, ওদের জীবনে কি সংগ্রাম আছে বলতে পার? এই যে বাতাসটা গাছের পাতায় দোল দিয়ে, ফুলের গায়ে হাত বুলিয়ে কাণের পাশ দিয়ে দিনরাত ব'য়ে যাচ্চে, এর মধ্যে তো সংগ্রামের কোন সুরই নাই। তবে মানুষের জীবনেই বা সংগ্রাম কেন? এ সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে

মানুষ কি পায় ? সুখ ? কিন্তু এই সুখটাই যে একটা মস্ত সমস্যা ভূপীদা।

বাস্তবিক ভূপীদা, সুখ জিনিষটাই মস্ত সমস্যা নয় কি ? এই জিনিষ-টাকে কে না চায় ? পৃথিবীর সুশিক্ষিত সুসভ্য জাতি হ'তে সেই আদিম অসভ্য বর্ব্বর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই এটাকে পাবার জন্য কি ঘোরতর সংগ্রামই না কচ্চে। কিন্তু কেউ কথন পুরোপুরি পেয়েছে ব'লে শুনেছ কি ? পায় না ব'লেই কত লোক আবার এই সংগ্রাম ত্যাগ ক'রে একটা অজানিত সুখের কল্পনায় সংসার পর্য্যন্ত ছেড়ে চলে যাচ্চে, বনে জঙ্গলে বা পাহাড়ের নির্জ্জনগুহায় ব'সে যতদূর সম্ভব আত্মপীড়ন পর্য্যন্ত কত্তে ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু তারাও এই জিনিষটুকুকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত কত্তে পেরেছে কি ? খুব সম্ভব পারে না ; না পারলেও মানুষ কিন্তু এর আশা ছাড়ে না। ধনী আপনার সুরম্য অট্টালিকায় ব'সে সহস্র সহস্র বিলাসের উপকরণ দিয়ে সুখকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য যেমন দিনরাত চেষ্টা কচ্চে, দীন দরিদ্র ভিখারীও সেইরূপ আপনার জীর্ণকন্থা দিয়ে সুখের গাঁটরী বাধবার কল্পনায় বিভোর হ'য়ে র'য়েছে। অথচ চেষ্টা কারো সফল হচ্চে না। সুতরাং এই সুখটাই একটা মস্ত সমস্যা নয় কি ভূপীদা ? পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হ'তেই বোধ হয় এই জটিল সমস্যাটা চলে আসচে, আজও তার মীমাংসা হয় নি। কখনও হবে কি ?

আমার কথা শুনে তুমি হয়তো হাসবে। কিন্তু হাস, আর যাই কর, আমি শীগ্‌গীর তোমার কাছে গিয়ে এর একটা মীমাংসা না ক'রে ছাড়ছি না।

আশা করি তুমি ভাল আছ। ললিতা কেমন আছে ? ইতি"

চিঠী শেষ করিয়া ভূপেন ললিতার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল,

ললিতার মুখখানা খুব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। ঈষৎ হাসিয়া ভূপেন বলিল, "তোর মুখখানাও যে দেখছি ভাবুকের মত গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। কিছু বুঝলি ?"

গম্ভীর স্বরে ললিতা উত্তর দিল, "একটু একটু।"

আগ্রহের সহিত ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্ দেখি ?"

ললিতা বলিল, "নরেন বাবুর জীবনে একটা বিপ্লব উপস্থিত হ'য়েছে।"

ভূপেন বলিল, "রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, এই সব বিপ্লবই তো জানি ; জীবনবিপ্লবটা কি রকম ললি ?"

ললিতা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিষাদগম্ভীরস্বরে বলিল, "নরেন-বাবু বড় অসুখী দাদা।"

ভূপেনের হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা একটু ম্লান হইয়া আসিল ; আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি ?"

ললিতা বলিল, "হাঁ ; তাঁকে এখানে আসতে লিখে দাও দাদা।"

ভূপেন বলিল, "লিখতে হবে না, সে নিজেই আসবে বলেছে। কিন্তু বাস্তবিকই যদি সে অসুখী হয়, এখানে এলেই তার কি হবে ?"

চিন্তাগম্ভীর মুখে ললিতা বলিল, "তা ঠিক বলতে পারি না, তবু তাঁর একবার আসা দরকার।"

ভূপেন তাহার চিন্তামলিন মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই লিখে দেব।"

বলিয়া সে একখানা চৌকী টানিয়া আনিয়া জানালার পাশে বসিল। পথপ্রান্তবর্ত্তী সৌধচূড়ায় সায়াহ্নের শেষ আলোক নৃত্য করিতেছিল। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন আছিস্ ললি ?"

মৃদুস্বরে ললিতা উত্তর দিল, "অনেকটা ভাল।"

"মাথার অসুখটা আজ জানতে পাচ্ছিস্?"

"সামান্য।"

"তবু বই নিয়ে ব'সেছিস্।"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল, "এ একখানা উপন্যাস।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে ভূপেন বলিল, "উপন্যাস বুঝি বই নয়? না ললি, তোর সবটাই বাড়াবাড়ি। ডাক্তার না লেখাপড়া কত্তে বারণ করেছে?"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "আমার বাড়াবাড়ি নয় দাদা, তোমারই বাড়াবাড়ি। কি একটু সামান্য অসুখ, তুমি একেবারে ডাক্তার এনে ওষুধপত্র নিয়ে বাড়ীখানাকে হাঁসপাতাল ক'রে তুলেছ।"

ক্ষুব্ধস্বরে ভূপেন বলিল, "খুব অন্যায়ই ক'রেছি ললি। রোগের চরম বৃদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার মত সহিষ্ণুতা আমার নাই।"

লজ্জিতভাবে ললিতা বলিল, "রাগ ক'রো না দাদা; মেয়ে মানুষের একটু অসুখ নিয়ে তুমি যে রকম ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ—"

ভূপেন বলিল, "অসুখের কাছে মেয়ে পুরুষের প্রভেদ নাই ললি। তা ছাড়া অন্য মেয়ে হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু মনে রাখিস্, তুই আমার বোন।"

ভূপেনের চোখ দুইটা উজ্জ্বল হইয়া আসিল। ললিতা নতমুখে আবদারের সুরে বলিল, "তাই ব'লে বুঝি বই পর্য্যন্ত একটু পড়তে পারবো না? শুধু শুয়ে ব'সে আমার সময় কাটে না।"

ভূপেন বলিল, "যে সব মেয়ে লেখাপড়া জানে না, তাদের সময় কাটে কি ক'রে?"

ললিতা বলিল, "ঘরকন্নার কাজে। বল তো আমিও তাই নিয়ে সময় কাটাই।"

বলিয়া ললিতা একটু হাসিল। ভূপেন সহাস্যে বলিল, "আমার হুকুমের অপেক্ষাতেই বুঝি তুই ও কাজগুলো করিস্ না ?"

ঠোঁটটা একটু ফুলাইয়া ললিতা বলিল, "তা নয় তো তুমি বুঝি মনে কর আমি ঘরকন্নার কাজ জানি না।"

ভূপেন হাসিয়া বলিল, "সে সম্বন্ধে আমার ধারণাটা নিঃসন্দেহ।"

মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া ললিতা বলিল, "ইঃ, আমি এতই কচি খুকী না কি ?"

ভূপেন হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "না, তোর বয়স সতের বছরের এক দিনও কম নয় ললি।"

ভ্রাতার মুখের উপর কৃত্রিম কোপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ললিতা ঈষৎ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমাকে এতই অক্ষম মনে কর বুঝি ? আচ্ছা, কালই আমি রাঁধতে পারি কি না তার প্রমাণ দেব।"

ভূপেন বলিল, "বেশ, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি নয়। যদি এত দিন পর্য্যন্ত আপনার সক্ষমতাকে ঢেকে রাখতে পেরেছিস্, তখন আর দিন কতক তার প্রমাণ না দিলেও কোন ক্ষতি হবে ব'লে বোধ হয় না। আগে অসুখটা সেরে যাক্, তারপর একদিন চম্পটী সাহেবকে নিমন্ত্রণ ক'রে তোর রন্ধন বিদ্যায় অভিজ্ঞতার পরীক্ষা লওয়া যাবে।"

ললিতা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া দৃষ্টিটাকে বাহিরের ম্লান আলোকের দিকে নিক্ষেপ করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভূপেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা ললি!"

ললিতা ফিরিয়া চাহিল। ভূপেন কিন্তু আর কিছু বলিল না, এক টুকরা কাগজ মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া পাকাইতে লাগিল। ললিতা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিলে দাদা?"

ভূপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলছিলাম—আচ্ছা, লীলাকে তোর কি রকম মনে হয়?"

ললিতা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "খুব ভালই মনে হয়। বেশ সুন্দরী।"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "তোর চাইতেও নাকি?"

ললিতা জোর গলায় বলিল, "দু'শো বার। আমি তার কাছে দাঁড়াতেই পারবো না।"

"এতদূর" বলিয়া ভূপেন একটু হাসিল, এবং হাতের কাগজটাকে বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "কিন্তু কৈ, কবিদের সেই 'তিলফুল জিনি নাসা, কোকিল জিনিয়া ভাষা' তার তো একটাও দেখতে পাই না।"

গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া ললিতা বলিল, "তামাসা রেখে দাও দাদা, বাস্তবিকই লীলা শতেকের মধ্যে একটী সুন্দরী।"

ভূপেন হাস্যগম্ভীর স্বরে বলিল, "তুই যে তার মস্ত একজন স্তাবক দেখছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ললি, সে এখন এখানে উপস্থিত নাই।"

"থাকলে কি হ'তো? পুরস্কার দিত?"

"এমন স্তাবককে পুরস্কার না দিয়ে কেউ থাকতে পারে না।"

"তার পুরস্কারটা না হয় তুমিই দাও দাদা।"

"আমি—আমি কি পুরস্কার দেব ?"

আমি যা চাই।"

"অর্দ্ধেক রাজত্ব নয় তো ?"

"তার চাইতে বেশী।"

ঈষৎ হাসিয়া ভূপেন বলিল, "সেই কি—বলি রাজার ত্রিপাদভূমি নাকি ?"

সহাস্যে ললিতা বলিল, "কতকটা সেই রকম বটে।"

কৃত্রিম ভীতিপূর্ণ স্বরে ভূপেন বলিল, "সর্ব্বনাশ! তুই কি চাস্ ললি ?"

ললিতা বলিল, "আমি ঠিক তোমার বোনের মতই চাইবো, তার বেশী হবে না।"

ভূপেন বলিল, "আচ্ছা, তোর প্রার্থনাটাই কি শুনি।"

তাহার মুখের উপর হাস্যপ্রফুল্ল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ললিতা বলিল, "লীলাকে যত শীগ্‌গীর হয়, আমার বড় বোনের জায়গায় বসাতে চাই।"

ভূপেনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ললিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। ললিতা বলিল, "কি বল দাদা ?"

চিন্তিতভাবে ভূপেন বলিল, "আমি এখনো ওঁদের কাছে এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করি নাই।"

ললিতা। প্রস্তাব করলেও সেটা নিষ্ফল হবে না নিশ্চয়।

চিন্তাগম্ভীর স্বরে ভূপেন বলিল, "কিন্তু সেটা আর একটা প্রস্তাবের উত্তরের উপর নির্ভর কচ্চে ললি।"

বলিয়া সে ললিতার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ললিতা দৃষ্টি নত করিয়া কি উত্তর দিবে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাহিরের দরজায় মোটরের শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাতের বইখানা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং সে ঘরের বাহির হইবার পূর্ব্বেই এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া হাস্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "চমৎকার! এই মাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।"

"আমার সৌভাগ্য" বলিয়া যুবতী একটু হাসিল, এবং ভূপেনের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিল। ললিতা তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া সোফায় বসাইল, এবং সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। সেই সমুজ্জ্বল আলোকে ভূপেন চাহিয়া দেখিল, বাস্তবিক লীলা সুন্দরী; তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলের স্থির সৌন্দর্য্যে বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রভাও যেন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে ভূপেন যেন সেই মুখের সমগ্র সৌন্দর্য্য পান করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ললিতা চৌকীটা কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাতে বসিয়া বলিল, "এ সময়ে আপনার দেখা পাবার আশা আমি করি নাই।"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া লীলা উত্তর করিল, "আমারও আসবার কথা ছিল না। শুধু আপনাকে দেখতেই আসা। আপনার না অসুখ?"

সলজ্জভাবে ললিতা বলিল, "এমন বিশেষ কিছু নয়, সামান্য মাথার অসুখ।"

লীলা যেন কতকটা আশ্বস্তভাবে বলিল, "সর্ব্বরক্ষে, দাদা তো অসুখের কথা শুনে একেবারে যেন পাগল।"

বলিয়া সে ললিতার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই ললিতা ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। লীলা খুব মনোযোগের সহিত তাহার এই মুখভাবের পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করিয়া গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "দাদাও এসেছেন। তিনি এই কাছেই কি কাজে একবার গেলেন। এখনি বোধ হয় আসবেন।"

ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার এই মৌনভাবটা লীলার ভাল লাগিল না। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার শরীর ভাল নয়; আমি এসে হয় তো আপনাকে বিরক্ত কচ্চি।"

সচকিতে ললিতা বলিয়া উঠিল, "না না, এরকম কথা আপনি মনে করবেন না। বাস্তবিক আপনাকে দেখে আমার খুবই আনন্দ হ'য়েছে।"

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিয়া লীলা বলিল, "কিন্তু আপনার দাদা বোধ হয় বেশ আনন্দ লাভ করেন নি।"

ললিতা বলিল, "আপনার এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক।"

লীলা বলিল, "কিন্তু আমার বোধ হয় সমূলক। নতুবা তিনি কথনই এ ঘর হ'তে চলে যেতেন না।"

ললিতা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। লীলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তাঁর এরূপভাবে যাওয়া উচিত হয় নি।"

ললিতা নিরুত্তর। লীলা একটু কঠোর স্বরে বলিল, "আপনি রাগ করবেন না, ইংরাজদের সঙ্গে না মিশলে প্রকৃত ভদ্রতা শিক্ষা করা যায় না।"

ঈষৎ রূঢ়স্বরে ললিতা বলিল, "আপনার দাদা ইংরাজদের সঙ্গে মিশে ভদ্রতাকে বোধ হয় একেবারে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছেন ?"

একটু জোর গলায় লীলা বলিল, "নিশ্চয়। ভূপেন বাবুর উচিত, দাদার কাছে কিছুদিন থেকে এটিকেট্ শিক্ষা করা।"

শ্লেষের তীব্র হাসি হাসিয়া ললিতা বলিল, "এটা আপনার ভুল ধারণা। আমার দাদার শিক্ষার কাছে আপনার দাদা দাঁড়াতেই পারেন না।"

লীলা উত্তেজিত ভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই চম্পটী সাহেব দরজার উপর দাঁড়াইয়া হাস্যপ্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "এ কথার প্রতিবাদ আমি করি না লীলা, বরং সমর্থনই করি।"

লীলার চোখ মুখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। সে দরজার দিকে একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সক্রোধে মুখ ফিরাইয়া লইল। ললিতার মুখখানাও লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। চম্পটী সাহেব সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং ললিতার পাশের চেয়ারখানার উপর বসিয়া লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক লীলা, ভূপেনের মত চরিত্র প্রায় দেখা যায় না; আর এই চরিত্রগুণেই, বয়সে ছোট হ'লেও আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।"

অতঃপর তিনি কক্ষের ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভূপেন গেল কোথায়?"

"বাড়ীতেই আছেন, ডেকে দিচ্চি" বলিয়া ললিতা উঠিবার উপক্রম করিতেই চম্পটী সাহেব ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তোমার আর কষ্ট ক'রে ওঠবার দরকার নাই; আমাদের এখনি ফিরতে হবে। তুমি আজ কেমন আছ?"

ললিতা সলজ্জভাবে উত্তর করিল, "ভাল।"

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "যা হোক আমার কিন্তু অসুখ শুনে বড়ই ভয় হয়েছিল।"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। চম্পটী সাহেব তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমার কিন্তু এ অবস্থায় মুক্তবায়ুতে খানিকটা বেড়ান দরকার।"

ললিতা ইহার কোন উত্তর দিল না। চম্পটী সাহেব তাহার এই নিরুত্তরতার মধ্যে যে উপেক্ষার ভাব দেখিতে পাইলেন, সেটাকে যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বলিলেন, "কাল বিকেলে মোটর পাঠিয়ে দেব।"

তাঁহার এই অস্বাভাবিক সহিষ্ণুতায় লীলা যেন বিচলিত হইয়া পড়িল; সে তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে চম্পটী সাহেবের মুখের দিকে চাহিতেই ললিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তভাবে চম্পটী সাহেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, "আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু শুধু মোটর পাঠালেই হবে না, আপনাকেও থাকতে হবে।"

"আনন্দের সহিত" বলিয়া চম্পটী সাহেব তাহার মুখের দিকে হাস্য-প্রফুল্ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই ললিতা একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া মস্তক নত করিল। লীলা পাংশুমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

এমন সময় ভূপেন ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। চম্পটী সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ভূপেন, চমৎকার! কোথায় ছিলে এতক্ষণ? লীলা তো তোমার ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে।"

মৃদু হাসিয়া ভূপেন বলিল, "এজন্য আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইচি।"

চম্পটী সাহেব বসিয়াছিলেন; সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ব্যস্, এইবার তো সব গোলযোগ চুকে গেল। না লীলা, এর পর আর কোন কথা বলা চলে না। আর তুই 'না' বল্‌লেও আমি ও বেচারীকে ক্ষমা না করেই থাকতে পাচ্চি না।"

ললিতা এ কথায় হাসিয়া উঠিল; লীলাও না হাসিয়া থাকিতে

পারিল না। অতঃপর চম্পটী সাহেব সহাস্যমুখে বিদায় লইয়া লীলার সহিত প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ললিতা অনুযোগের স্বরে বলিল, "না দাদা, এটা তোমার নেহাৎ অন্যায়।"

সহাস্যে ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌টা অন্যায় ললি?"

ললিতা মুখ ভার করিয়া বলিল, "এ রকম ক'রে তোমার চলে যাওয়া—না দাদা, তোমার এ ব্যবহারের অনুমোদন আমি কিছুতেই কত্তে পারি না।"

এ কথায় ভূপেন নীরবে মৃদু হাস্য করিল। ললিতা মুখখানাকে আরও একটু ভারী করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

———

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চম্পটী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ললিতা বলিল, "আমাকে কি মাপ কত্তে পারেন না, চম্পটী সাহেব ?"

চম্পটী সাহেবের উদ্বেগরক্তিম মুখখানা মুহূর্ত্তে পাণ্ডুর হইয়া আসিল ; তিনি ম্লান সকাতর দৃষ্টিটা ললিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "আমি মাপ কর্‌লেই যদি তুমি সুখী হও, তবে আমি তাতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার ভালবাসা তোমার কাছে এতই অযোগ্য বিবেচিত হবে না এমন আশাও কি আমি কত্তে পারি না ?"

ললিতা আরক্তমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অদূরে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবীর চঞ্চল বক্ষে সায়াহ্ন সূর্য্য সুবর্ণধারা ঢালিয়া দিতেছিল ; তরঙ্গের উত্থানে পতনে স্বর্ণস্রোত ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছিল ; দূর চক্রবালপ্রান্তে লাল মেঘের পাশ দিয়া অগ্নিময় গোলক অলসভাবে গড়াইয়া পড়িতেছিল। চম্পটী সাহেব বেঞ্চির এক পাশে হেলিয়া পড়িয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্মুখ দিয়া শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা দলে দলে চলিয়া যাইতেছিল ; তাহাদের হাস্যকৌতুকপ্রমত্ত স্বর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছিল। এক ফিরিঙ্গী যুবক ললিতার দিকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া শিষ টানিয়া চলিয়া গেল। ললিতা মুখ ফিরাইয়া একটু জড়সড় হইয়া বসিল। ত্রাসে তাহার কপোলদেশের রক্তিমা যেন আরও একটু গাঢ় হইয়া আসিল। চম্পটী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভয় কচ্চে ললিতা ?"

যেন নিতান্ত উপেক্ষার সহিত ললিতা উত্তর দিল, "না।"

চম্পটী সাহেব সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "ছ'টা বেজে গিয়েছে; এবার উঠবে কি?"

ললিতা বলিল, "আর একটু হোক্ না।"

চম্পটী সাহেব দূর আকাশপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আকাশের আলোকরেখার ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল; অন্ধকারের ধূসর ছায়া আসিয়া আলোকের স্থান অধিকার করিল। চম্পটী সাহেবের বোধ হইল, যেন নৈরাশ্যের গভীরতার মধ্যে আশার অস্তিত্বটুকু ডুবিয়া যাইতেছে, মৃত্যুর কালো ছায়া আসিয়া জীবনের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিতেছে। যেন একটা গভীর নিরানন্দের আবরণে জগতের সব আশা, সকল আনন্দ আবৃত হইয়া যাইতেছে। চম্পটী সাহেবের বক্ষ কম্পিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। হায়, দাহিকা শক্তি ছাড়া রূপের কি আর কোন সার্থকতা নাই?

সহসা ললিতা ডাকিল, "চম্পটী সাহেব!"

সে আহ্বানে চম্পটী সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। ললিতা বলিল, "আচ্ছা চম্পটী সাহেব, ভালবাসা জিনিষটা ঠিক আকাশকুসুমের মত নয় কি?"

চম্পটী সাহেব বিস্ময়ে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ললিতা নতমুখে সহাস্যস্বরে বলিল, "আমার তো বোধ হয় এটা একটা অলীক কল্পনা।"

বিস্ময়জড়িত স্বরে চম্পটী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে তুমি কোন্ জিনিষটাকে সত্য বলতে চাও ললিতা?"

ললিতা একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "আমার মনে হয়, এর ভিতর সত্য যেটুকু আছে, সেটুকু মোহ। সেটা রূপজ মোহও হ'তে পারে, গুণজ মোহও হ'তে পারে।

ঈষৎ হাসিয়া চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তোমার এই ভুল ধারণার আমি প্রতিবাদ করি। কেন না মোহ এক, ভালবাসা আর। অবশ্য ইংরাজী 'লভ' এর অনুবাদে যে ভালবাসা কথাটা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেটা মোহ হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা যা, তার সঙ্গে মোহের সম্পর্ক নাই।"

ললিতা নীরবে মৃদু হাস্য করিল। গম্ভীরভাবে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "ধর, তুমি তোমার দাদাকে ভালবাস, আর সে ভালবাসাকে কিছুতেই মোহ বলা চলে না, সেটা প্রকৃতির একটা অচ্ছেদ্য আকর্ষণ। ভূপী রূপবান্ হোক কুরূপ হোক, গুণবান্ হোক বা নিগুর্ণ হোক, তাকে ভালবাসতেই হবে, প্রকৃতির এই আকর্ষণকে কিছুতেই বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না।"

ললিতা বলিল, "সেটা আপন জনের উপর স্বাভাবিক আকর্ষণ। মনে করুন, দাদাকে সুখী করবার জন্য আমি অনেকটা স্বার্থ ত্যাগ কত্তে পারি, আবার আমার জন্য দাদাও অনেকটা স্বার্থ ত্যাগ কত্তে পারেন। কিন্তু অপরে তা পারে কি?"

চম্পটী সাহেব বলিলেন, "যে ভালবাসে, সে নিশ্চয়ই পারে।"

ললিতা বলিল, "মাপ করবেন, সে ত্যাগের মধ্যেও আমি কিন্তু মোহের আকর্ষণটাই দেখতে পাই। হয় তো সে আমার সৌন্দর্য্যের মোহে লুব্ধ হয়েই স্বার্থত্যাগে উদ্যত হ'য়েছে।"

চম্পটী সাহেবের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তিনি গম্ভীর সতেজ-কণ্ঠে বলিলেন, "এটাও তোমার একটা ভুল ধারণা। ঈশ্বর না করুন, কোন দিন যদি তোমার সৌন্দর্য্যের অভাব উপস্থিত হয়, আর তখনও যদি কেউ তোমার কাছে ভালবাসার উদাহরণ প্রদর্শন কত্তে পারে—"

বলিয়া তিনি ললিতার মুখের উপর আবেগস্ফীত দৃষ্টি স্থাপন করিতেই ললিতা মাথা নীচু করিল, এবং ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ওঃ, সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চম্পটী সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ললিতাকে লইয়া নিঃশব্দে মোটরে আরোহণ করিলেন। তখন চৌরঙ্গীর রাজপথ আলোকের মালা পরিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে; সেই আলোক মালার মধ্য দিয়া দুইজনে হৃদয়ে গুরুভার লইয়া নীরবে ছুটিয়া চলিল।

দরজায় গাড়ী থামিলে ললিতা দেখিল, দরজায় ভূপেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ললিতাকে দেখিয়াই ভূপেন বলিয়া উঠিল, "নরেন এসেছে ললি; এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে এইমাত্র চলে গেল।"

ললিতা এক পা গাড়ীতে এবং একটা পা গাড়ীর পাদানীর উপর রাখিয়া, ভূপেনের দিকে চমকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "চলে গেলেন?"

ভূপেন হাসিয়া বলিল, "তুই যে একেবারে অবাক্ হ'য়ে পড়্লি ললি? সে আজ সবে মাত্র এসেছে। কাল সকালে তাকে চা খাবার নিমন্ত্রণ করেছি।"

আপনার চমকিত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ললিতা গাড়ী হইতে নামিল, এবং চম্পটী সাহেবের দিকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আশা করি, আপনিও কাল সকালে—"

বক্তব্য শেষ করিবার অবসর না দিয়াই চম্পটী সাহেব প্রফুল্ল হাস্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আনন্দের সহিত।"

বলিয়া চম্পটী সাহেব হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা যাত্রার অস্থির সঙ্কল্প লইয়া নরেন সকালে যখন গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহার মাথা ভার, শরীরে কেমন জড়তা। একি, জ্বর হইল নাকি? নরেন বার কতক মাথাটা নাড়িয়া, বাঁ হাত দিয়া নিজের নাড়ী টিপিল। নাড়ীটা যেন ভার, তাহার স্পন্দনও যেন একটু দ্রুত। নরেন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন, "হাঁ, জ্বর বটে।"

নরেনের মুখখানা ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "ম্যালেরিয়া নাকি?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "জ্বর হ'লেই যে ম্যালেরিয়া হ'তে হবে তার কোন কারণ নাই।"

ভীতভাবে নরেন বলিল, "ম্যালেরিয়ায় তো দাঁড়াতে পারে?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "কি হ'তে পারে না পারে, সে কথা আগে বলা যায় না।"

নরেন চিন্তিত হইল। ডাক্তার আপাতত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

নরেন কিন্তু ডাক্তারের ঔষধের উপর নির্ভর করিতে পারিল না, ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় সে নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল, এবং এই আশঙ্কার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ম্যালেরিয়া-জীর্ণ পল্লী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন করিবে ইহাই স্থির করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ

গোপীনাথকে ডাকিয়া তাহার কলিকাতা যাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিল।

মহামায়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জ্বর হ'য়েছে ঠাকুর পো ?"

নরেন উত্তর দিল, "হাঁ।"

"এই জ্বর নিয়ে তুমি আজই নাকি কলকাতায় যেতে চাইচো ?"

"কাজেই। শেষে কি ম্যালেরিয়ায় ধরবে ?"

"একটু জ্বর হ'লেই যে ম্যালেরিয়া হবে এমন কথা তোমায় কে বল্‌লে ?"

"ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত হাওয়ার মধ্যে জ্বর হ'লেই ম্যালেরিয়া হবে, ডাক্তারী শাস্ত্রের এই মত।"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "সকলেই যদি তোমার মত শাস্ত্র মেনে চলে ঠাকুর পো, তা হ'লে দেশটা তিন দিনেই যে বন হ'য়ে দাঁড়াবে।

নরেন বলিল, "বন হ'তেই আর বাকী কি ? দেশে মানুষ ক'জন আছে বৌদি ?"

একটু তীব্রস্বরে মহামায়া বলিলেন, "তোমার মত বীর পুরুষ বেশী নাই বটে, তবে আমাদের মত দুর্ব্বল লোক এখনো অনেক আছে।"

গম্ভীরভাবে নরেন বলিল, "প'ড়ে মার খাওয়াকে বীরত্ব বলে না।"

"পলায়ন করাও বীরত্ব নয়।"

"শত্রুর চোরা বাণ হতে রক্ষা পেতে পলায়নই প্রশস্ত উপায়, এটা যুদ্ধ-নীতির অনুমোদিত।"

একটু ভাবিয়া মহামায়া বলিলেন, "তুমি যে একজন মস্ত নীতিজ্ঞ

তা জানতে আমার বাকী নাই, কিন্তু এই জ্বর নিয়ে যাচ্ছ, যদি একটু বাড়ে সেখানে দেখ্‌বে কে ?"

সহাস্যে নরেন উত্তর করিল, "ভগবান।"

মহামায়া আর কিছু বলিলেন না, নরেনও কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইল।

যাত্রার পূর্ব্বে মহামায়া বলিলেন, "যদি যেতেই হয়, একজন চাকর-বাকর নিয়ে যাও ঠাকুরপো।"

নরেন বলিল, "নিজে থাকবো মেসে, চাকরবাকর নিয়ে রাখ্‌বো কোথায়।"

মহামায়া বলিলেন, "মেসে কেন ? যদি সেখানে থাকতেই হয়, একখানা বাড়ী নিয়ে থাক্‌লেই তো পার।"

নরেন বলিল, "থাকবো একা, এক খানা বাড়ী নিয়ে করবো কি ?"

একটু রাগতভাবে মহামায়া বলিলেন, "একাই বা থাকতে যাবে কেন ? ছোট বৌ সেখানে গিয়ে থাকুক না।"

যেন খুব বিস্ময়ের সহিত নরেন বলিয়া উঠিল, "কে থাক্‌বে ?"

মহামায়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ছোট বৌ গো ছোট বৌ, তোমার স্ত্রী। তাকে চেন না ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "খুব চিনি বৌদি, খুব চিনি, আর সেই জন্যেই তোমার প্রস্তাবে সায় দিতে পারলাম না।"

মহামায়া বলিলেন, "সে কি তোমার সঙ্গে যেতে চায় না ?"

নরেন বলিল, "মাপ কর বৌদিদি, এমন অসম্ভব কথা জিজ্ঞাসা কত্তে কোন দিন সাহস হয় নাই।"

"খুব সাহসী পুরুষ তুমি," বলিয়া মহামায়া মুখ মচকাইয়া একটু হাসিলেন।

যাত্রাকালে নরেন যখন কাপড় জামা পরিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, তখন অপর্ণা সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যি কি তুমি আমায় চেন ?"

তাহার এই আকস্মিক উপস্থিতিতেই নরেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর এই উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্নটা তাহাকে এমনই প্রগাঢ় বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিল যে, নরেন হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না; শুধু বিস্ময়-স্তিমিত দৃষ্টিতে অপর্ণার ক্রোধ-রক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপর্ণাও আর কিছু বলিল না, শুধু রুক্ষ দৃষ্টিটা নরেনের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

একটু পরে নরেন আপনার বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবটা সামলাইয়া লইয়া ধীর সহাস্য কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিক কি আমি তোমায় চিনি না ?"

জোরে মাথা নাড়িয়া সতেজ কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "একটুও না।"

মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল, "তা হ'তে পারে।"

অপর্ণা বলিল, "তা হ'লে তুমি দিদির কাছে এমন মিথ্যা কথাটা বল্‌লে কেন ?"

অপর্ণার স্বরটা অভিমানে যেন গাঢ় হইয়া আসিল। নরেন কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়াই উত্তর দিল, "আমি মিথ্যা বলি নাই; যা সত্য ব'লে জানতাম—"

বাধা দিয়া অপর্ণা বলিল, "কিসে তুমি সত্য ব'লে জান্‌লে ?"

তাহার ভ্রুকুটি-কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া নরেন একটু তীব্র স্বরে বলিল, "এখন তোমার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় নাই ? আর যাত্রার সময় তোমাকে কতকগুলা কড়া কথা শুনিয়ে যেতে চাই না।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপর্ণা বলিল, "আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে চাই।"

বিস্ময়ের সহিত নরেন বলিয়া উঠিল, "আমার সঙ্গে!"

"হাঁ।"

"কেন যাবে?"

"আমার ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছায় তুমি পরিচালিত হতে পার, কিন্তু অপরের উপর যে তার আধিপত্য চলবে এটা মনে করা তোমার অন্যায়।"

অপর্ণার রোষদীপ্ত মুখ খানা যেন ম্লান হইয়া গেল। নরেন তাহা লক্ষ্য করিয়া তীব্র পরিহাসের স্বরে বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি, বৌদির তাড়নায় তুমি হঠাৎ এই পতিভক্তিটা দেখাতে এসেছ; কিন্তু ভক্তি জিনিষটা আপনা হ'তে প্রাণের ভিতর থেকে ধ্বনিত হ'য়ে না উঠলে সেটা ঠিক বে-সুরা গানের মতই বিশ্রী মনে হয়। ওটাকে যদি আয়ত্ত করবার ইচ্ছা থাকে, তবে কিছু দিন বৌদির কাছে থেকে শিক্ষা কর, তার পর আমার কাছে এসো।"

নরেন আর দাঁড়াইল না; তাচ্ছীল্য-সূচক মুখভঙ্গী করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তাহার তীব্র স্বরটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া অপর্ণার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বাহিরে আসিয়া নরেন কোন দিকে না চাহিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, এবং মুখ বাড়াইয়া সত্বর গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল; একজন চাকর ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া গাড়ীর পিছনে উঠিয়া বসিল।

কলিকাতায় পৌছিয়া নরেন যেন আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল,

এবং গাড়ী করিয়া পটল ডাঙ্গার মেসে উপস্থিত হইল। তখনও মেসের ছেলেরা কলেজ হইতে ফিরে নাই, শুধু রাখাল পূর্ব্ব রাত্রিতে থিয়েটার দেখিয়াছিল বলিয়া কলেজ কামাই করিয়াছিল। সে সিঁড়ীতে নরেনকে দেখিয়াই উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিল, "হ্যাল্লো, নরেন বাবু যে হঠাৎ ?"

বারান্দার বেঞ্চিখানার উপর বসিয়া পড়িয়া নরেন বলিল, "নীচে গাড়োয়ান আমার বিছানাপত্র নামিয়ে দিয়েছে, বেয়ারাটাকে ডেকে শীগ্‌গীর একটা ঘরে বিছানা পাতিয়ে দাও। শরীর বড্ড খারাপ, বসতে পাচ্চি না।"

খালি ঘর পরিষ্কার করিয়া বিছানা পাড়িয়া দিতে বিলম্ব হইবে, স্থতরাং রাখাল তাড়াতাড়ি নিজের বিছানাতেই নরেনকে শোয়াইয়া দিল। এক গ্লাস জল খাইয়া নরেন শুইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে কলেজপ্রত্যাগত ছেলেদের কলরবে নরেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাখাল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু খাবে ?"

নরেন বলিল, "আগে গ্রেণ দশেক কুইনাইন আনিয়ে দাও।"

রাখাল বলিল, "একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিলে ভাল হতো না ?"

নরেন বলিল, "দরকার নাই। ম্যালেরিয়ার এক মাত্র ওষুদ কুই-নাইন, এ আমার বেশ জানা আছে।"

কুইনাইন ও একটু গরম দুধ খাইয়া নরেন কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলে ছেলের দল তাহাকে ঘেরিয়া বসিল, এবং সে দেশে বসিয়া এত দিন কি করিয়াছে ও ভবিষ্যতে কি করিবে ইত্যাদি প্রশ্নে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। নরেন সংক্ষেপে জানাইয়া দিল যে, এত দিন দেশে থাকিয়া সে আহার ও নিদ্রা ব্যতীত এমন কোন কাজ করে নাই, যাহাকে একটা বড় কাজ বলিয়া পরিচয়

দেওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে যদি ম্যালেরিয়ার আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে সে হয় তো দেশে বসিয়া কোন একটা ভাল কাজ সম্পন্ন করিতেও পারে।

তাহার এই নৈরাশ্যজনক উত্তরে অনুকূল গম্ভীর ভাবে টিপ্পনী কাটিয়া বলিল যে, দেশের উপর এতটা ঔদাসীন্য শিক্ষিত যুবকের পক্ষে নিতান্তই লজ্জার কথা। শিক্ষিত যুবকেরাই দেশের আশাভরসা স্থল; তাহারা যদি দেশের উন্নতি কল্পে নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে তাহা দেশের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা। এই নিশ্চেষ্টতার ফলে আমাদের দেশ, বিশেষতঃ পল্লীজননী একেবারে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে; এবং পল্লীর এই দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দায়ী। তাহারা যদি বিলাসিতার মোহে মুগ্ধ হইয়া পল্লীবাস ত্যাগ না করিত, তাহা হইলে দেশের উপর ম্যালেরিয়া কখনই এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না।

তখন ম্যালেরিয়া দ্বারা দেশের কত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি, কি উপায়ে উহাকে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টের অভিমত কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সে আলোচনা প্রসঙ্গে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ম্যালেরিয়াজীর্ণ পল্লীর উদ্দেশ্যে এতই সহানুভূতি ও দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বহিতে লাগিল যে, তাহার কণামাত্র পল্লীর বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে ম্যালেরিয়া কোন্ দিন উড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া পড়িত, এবং সে আলোচনা শুনিলে যে কেহ মনে করিতে পারিত যে, পল্লীজননীর এই সুসন্তানগুলি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার দুঃখ-নিশার অবসানের আর বিলম্ব নাই; ইহাদের চেষ্টায় তাঁহার অন্ধকারময় মুখমণ্ডল শীঘ্রই স্বাস্থ্য-সুখের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

নরেন কিন্তু ততটা আশা করিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া মেসের বাহির হইয়া পড়িল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে ভূপেনদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে আসিয়া যখন শুনিল যে, চম্পটী সাহেবের বিবাহ প্রস্তাবে ললিতা সম্মতি দান করিয়াছে, এবং সে তাঁহার সহিত বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, তখন নরেনের জ্বর-জন্য অবসন্নতাটা যেন প্রবল হইয়া আসিল। সে আর বসিতে পারিল না; ললিতার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা না করিয়াই উঠিয়া পড়িল। ভূপেন পর দিন প্রাতে চায়ের নিমন্ত্রণ করিলে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া নরেন প্রস্থান করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পর দিন সকালে রাখাল সভয় বিস্ময়ে দেখিল যে, নরেনের মুখে গায়ে কি সব বাহির হইয়াছে। রাখাল ভয়ে ভয়ে গিয়া অন্যান্য ছাত্রদের নিকট এই সংবাদ প্রচার করিল। শুনিয়া সকলেই ভয়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অনুকূল ব্রুশ দিয়া দাঁতে মাজন ঘষিতেছিল, সে ব্রুশটা দাঁতের উপর রাখিয়াই স্তব্ধ দৃষ্টিতে রাধিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ফণী কলের পাশে বসিয়া রুমালে সাবান ঘষিতেছিল। সে ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া অনুকূলের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই তো, উপায় ?"

তাহার কথায় অনুকূলের যেন চমক হইল ; সে এক মুহূর্ত্তে উপায়টা স্থির করিয়া লইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "এখনি হেল্‌থ অফিসে খবর দাও।"

রাধিকা ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "হেল্‌থ অফিসে খবর দিলে কি হবে ?"

তাহার এই অনভিজ্ঞতায় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া অনুকূল উত্তর দিল, "কি হবে কি ? তারা কলেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।"

কলেজের নাম শুনিয়া সকলের মুখেই ভীতির ছায়াটা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। কাহারও মুখ দিয়া ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। তাহাদের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দর্শনে অনুকূল যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, "সব হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? এই তো কাছেই কর্পোরেশন অফিস।"

ফণী আস্তে আস্তে রুমালের উপর সাবান বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কিন্তু কলেজে দেওয়া—"

তাহাকে কথা সমাপ্তির অবসর না দিয়াই অনুকূল বলিল, "কলেজে দেবে না তো রাখবে কোথায়? জান, 'পক্স' কত বড় সংক্রামক রোগ। ডাক্তারদের মতে—"

রাখাল বারান্দার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বাধা দিয়া বলিল, "দুঃখের বিষয় অনুকূল বাবু, সকল ডাক্তারের 'থিওরি' সমান নয়। আর তাঁদের সকল মত মেনে চলতে হলে সংসারে বাস করাই চলে না।"

মুখটাকে গম্ভীর করিয়া অনুকূল বলিল, "যার না চলে না চলবে, আমার কিন্তু তা হ'লে এ মেসে থাকা চলবে না।"

বলিয়া অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশায় রাধিকার মুখের দিকে চাহিল। রাধিকা কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া আপনার হাতের শিরাগুলার পরীক্ষায় গভীর মনোনিবেশ করিল। ফণী একটু জোরে জোরে রুমালে সাবান ঘষিতে লাগিল, আর রমেশ জ্বলন্ত উনানের উপর বসান কেটলিটার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার ক্রোধটাকে সকলেই উপেক্ষা করিতেছে বুঝিয়া অনুকূল আপনার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জানাইবার জন্য পাচক ঠাকুরকে উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা হ'লে ঠাকুর, আমার চাল নিও না।"

পাচক ঠাকুর রন্ধনশালা হইতে উত্তর দিলেন, চাউল অনেকক্ষণ লওয়া হইয়াছে, এবং ভাত এতক্ষণে অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া অনুকূল রাগিয়া উঠিল, এবং তাহার হুকুম না লইয়াই হাঁড়ীতে চাউল দেওয়ার জন্য ঠাকুরের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কিন্তু ঠাকুর

বেশ সহজ শান্তভাবেই জানাইয়া দিলেন যে, কোন কালেই প্রত্যেকের অনুমতি লইয়া হাঁড়ীতে চাউল দেওয়া হয় না, বরং যে দিন যাহার চাউল লইবার প্রয়োজন নাই, সেদিন সে নিজে আসিয়াই পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া যায়, ইহাই সনাতন রীতি।

অনুকূলও যে এই সনাতন রীতিতে অনভিজ্ঞ ছিল তাহা নহে। কিন্তু ছাত্রদের উপর সঞ্চিত ক্রোধটা যখন সোজা পথে প্রকাশ করিতে পারিল না, তখন একটু বাঁকা পথে ঠাকুরের উপর দিয়াই তাহাকে বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইল। বিগত পূজার সময় ঠাকুর অনুকূল বাবুর নিকট হইতে বোম্বাই মিলের একখান ৮ হাতী ধুতি পাইয়াছিল, সুতরাং উদারহৃদয় বাবুর তিরস্কারগুলা তাহাকে নীরবেই মাথা পাতিয়া লইতে হইল।

ঝি কিন্তু পূজার পর নিযুক্ত হওয়ায় কাপড় পায় নাই, সুতরাং বাবুর দানশক্তির উপর অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সে অনুকূলের এই অন্যায় তিরস্কার নিঃশব্দে সহ্য করিতে পারিল না; ঠাকুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "তা তুমি অত রাগ কচ্চো কেনে গা বাবু, মায়ের অনুগ্‌গেরো হ'য়েছে, তাতে কেনেই বা ভাত খাবেন না। মা কোথায় নাই, তাঁকে ভয় ক'রে পালাবেই বা কোথায়? বলে—জাল ছিঁড়ে পালাবে, পুকুর ছেড়ে তো পালাতে পারবে না। ভাল মানুষের ছেলের ব্যামো হ'য়েছে হোক না। মা দিয়েচেন, মাই দেখবেন। কলেজে পাঠাতে চাইচো, কিন্তু সেখানে গেলে কি বাঁচবে?"

তাহার দিকে রোষক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনুকূল বলিল, "এখানে থাকলে কে দেখবে বল্ তো মাগী।"

ঝি তর্জ্জন সহকারে বলিয়া উঠিল, "মাগী মাগী ক'রো না বাবু, তা

ব'লে রাখচি। তোমরা কেমনতর ভদ্দর নোক গা। তোমরা কেউ দেখতে না পার আমি দেখবো। দয়াময়ী মা আছেন, তিনি দেখবেন।"

সকলেরই বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি ঝির মুখের উপর পতিত হইল। অনুকূল কিন্তু বিরক্তির সহিত মুখটা ফিরাইয়া লইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমাদের যা ইচ্ছা কত্তে পার, আমি কিন্তু দিন কতক আমার মামাতো ভায়ের মেসে গিয়ে থাকছি।"

ঝি এবার অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে তাহাকে যেন সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "এত ভয় কচ্চো কেনে বাবু, এ সব মায়ের খেলা। একে কি ভয় কত্তে হয়, না ভয় করলেই পরিত্রাণ আছে।"

অনুকূল ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "চুপ্ কর্ মাগী, তোকে আর এত লেক্‌চার দিতে হবে না।"

ফণী সাবান রুমাল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সাবান-মাখা হাতটা অনুকূলের সম্মুখে উঁচু করিয়া বলিল, "দেশ নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে তুমিও বিস্তর লেক্‌চার দাও অনুকূল বাবু। ও ছোটলোকের মেয়ে, তোমার মত লেক্‌চার দেবার ক্ষমতা ওর একটুও নাই। কিন্তু আমি পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বলছি অনুকূল বাবু, তোমাদের এই প্রাণহীন ফাঁকা আওয়াজে দেশের কাজ যদি একবিন্দুও হয় তবে আমি বামুনের ছেলেই নই। কাজ যদি কিছু হয়, তা ঐ ঝির মত লোকদের দ্বারাই হবে।"

বলিয়াই সে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং রুমালটা লইয়া জোরে জোরে আছাড় দিতে লাগিল। তাহার এই স্পষ্টোক্তিতে সকলের মুখেই এমন একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল যে, অনুকূল কোন দিকেই চাহিতে পারিল না; সে মুখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আনিয়া পাশের কলে গিয়া বসিল।

অনুকূলের অসাক্ষাতে সকল ছাত্রই ফণীর স্পষ্টবাদিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, ফণী আর রাখাল ছাড়া আর সকলেই মেসে অনুপস্থিত। ফণী সন্ধান লইয়া জানিল, তাহারা পরিচিত অপরিচিত কোন মেসে বা আত্মীয়ভবনে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছে।

ফণী বলিল, "দেখলে রাখাল।"

রাখাল বলিল, "ভালই হ'য়েছে, এ সময়ে বাড়ীটা যত ফাঁকা থাকে ততই ভাল।"

কিন্তু খানিক পরে ঝি আসিয়া যখন জানাইল যে, অনুকূল বাবুর প্ররোচনায় বামুন ঠাকুর বোধ হয় গাঢাকা দিয়াছে, তখন রাখাল চিন্তিত হইয়া পড়িল। ফণী বলিল, "কুচ্ পরোয়া নাই। তুমি, আমি, ঝি, তিনটে লোকের ভাতে ভাত ক'রে নেবার ক্ষমতা আমার আছে।"

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

"ঝি !"

"কেন বাবা ?"

"আমাকে কি কলেজে দিয়েছে ?"

"বালাই, কলেজে দেবে কেন ? তুমি যে ঘরে আছ।"

ঘরে ? চক্ষু উন্মীলন করিয়া নরেন চমকিত ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিল; তার পর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ বাবা ?"

ক্লেশ-সূচক মুখভঙ্গী করিয়া নরেন বলিল, "বড় যাতনা।"

তাহার মাথায় পাখার বাতাস দিতে দিতে ঝি বলিল, "মাকে ডাক, তিনিই যাতনা দূর করবেন।"

নরেন ডাকিল, "মা, মা, মাগো !"

ঝিও সকাতর কণ্ঠে ডাকিল, "মা, দয়াময়ী, তোমার খেলা, তুমি পদ্মহাত বুলিয়ে দাও মা।"

"হাঁ ঝি !"

"কেন বাবা ?"

"তুমি না থাকলে এরা আমাকে কলেজে দিত ?"

"না না; অনুকূল বাবু এক বার বলেছিল বটে, কিন্তু তাতে কেউ মত দেয় নি।"

"মত সবাই দিত, ফণী বললে, তারও কলেজে পাঠাতে নেহাৎ অমত ছিল না। কিন্তু তোমার মহত্ব দেখে সকলকেই মত বদলাতে হ'লো।

তোমার মনুষ্যত্বের কাছে আপনাদের আভিজাত্যের অভিমানটাকে কেউ খাটো কত্তে পারলে না।"

ঝি নিঃশব্দে বাতাস করিতে লাগিল। নরেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভাগ্যে তুমি ছিলে ঝি, নইলে আমার কি হ'তো।"

একটু লজ্জিত ভাবে ঝি বলিল, "হতো আবার কি। ভগবান্ আছেন, তিনিই দেখতেন।"

নরেন বলিল, "ভগবানের যদি তোমার মত হাত পা থাক্‌তো, তা হ'লেও কতকটা আশা ছিল; কিন্তু তা যখন নাই,তখন দেখলেও তোমার মত দিন রাত পাখা চালাতে পারতো না নিশ্চয়।"

ঝি যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "ছি বাবা, অমন কথা বল্‌তে আছে ? ভগবানের হাত পা নাই বটে, কিন্তু করেন তো তিনিই সব। তিনি যদি আমাকে এখানে না আনবেন, তা হ'লে আমিই বা আসবো কেন, আর তুমিই বা আমার সেবা খাবে কেন ? এ সবই যে তাঁর যোগাযোগ বাবা।"

ইহার প্রতিবাদে অনেক কথা মনে আসিলেও ঝির স্থির বিশ্বাস-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া নরেন আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আচ্ছা ঝি, তোমার বোধ হয় ভদ্র বংশে জন্ম। শুধু পেটের দায়েই দাসীবৃত্তি কত্তে এসেছ ?"

ঝি মৃদু হাসিয়া বলিল, "না বাবা, আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে। তবে পেটের দায়েই এসেছি বটে।"

"তোমার কে আছে ?"

"ছিল সব, এখন আর কেউ নাই, আছে শুধু পোড়া পেট।"

বলিয়া ঝি একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কে ছিল ?"

ঝি একটু সোজা হইয়া বসিয়া কাঁধের কাপড়টা মাথার উপর তুলিয়া দিয়া বলিল, "ছেলে ছিল, সোয়ামী ছিল। সোয়ামী তো নয়, যেন অসুর অবতার। এক কোদালে দু'বিঘে ভুঁই কুপিয়ে তবে জল খেতো। তিন দিনের জ্বরে সে সোয়ামী চলে গেল। সে যেন একটা অসুরপাত। তারপর ছ'বছরের ছেলেটা, তাকেও রাখতে পারলুম না। মা-মরা তিন বছরের দেওর পো, তাকে ষোল বছরের করলুম, কিন্তু যম তার তরেও হাত পেতে বসেছিল।"

ঝির স্বরটা জড়াইয়া আসিল ; সে আঁচলের খুঁট দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। অশ্রুসজল কণ্ঠে নরেন বলিল, "এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি ঝি, আমার তরে কেন তোমার এতটা যত্ন। নিজে ঘা খেয়েছ ব'লেই পরকে সে আঘাত হ'তে রক্ষা করবার তরে তুমি ব্যস্ত। কিন্তু আমার মা নাই।"

কথাটা বলিতে নরেনের স্বর যেন আর্দ্র হইয়া আসিল। ঝি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "রাখাল বাবু তো তার করেছে। বোধ হয় বাড়ীর সব ছুটে আসবে।"

ম্লান স্বরে নরেন বলিল, "সব আর কে ; আসে তো বৌদি আসবেন।"

"বৌমা ?"

"সে আসবে না।"

নরেনের ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঝি বলিল, "তুমি পাগল হ'য়েছ বাবা। দেখবে, খবর পেলেই বৌমা যদি রায় বাঘিনীর মত ছুটে না আসে, তবে আমি কৈবত্তর মেয়েই নই।"

শুষ্ক হাসি হাসিয়া নরেন বলিল, "তা হ'লে দেখছি, তোমাকে গয়লার মেয়েই হ'তে হবে ঝি।"

ঝি সদম্ভে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি কার মেয়ে তা দেখে নিও। আমি এখন ছাতের ঘরটা পরিষ্কার ক'রে রাখি। যদিই আজ সব এসে পড়েন। জলও দু'বাল্‌তি তুলে রাখতে হবে। ছ'টা বাজলে পোড়া কলে তো এক ফোঁটা জল থাকবে না।"

পাখা রাখিয়া ঝি উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় ললিতা ঠিক ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, "নরেন বাবু!"

বলিয়াই সে থপ্‌ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িল। ভূপেন দরজার উপর দাঁড়াইয়া নরেনের বিস্ময়চকিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের তো কোন খবরই দাওনি নরেন। ভাগ্যে রাখাল বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো।"

মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল, "দরকার হয় নি ভূপীদা। কিন্তু এই ঝি যদি না থাকতো, তা হ'লে কলেজে যাবার আগে তোমাদের খবর না দিয়ে যেতে পারতাম না।"

ঝির দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, "মেসের ছেলেরা বুঝি সব পালিয়েছে?"

নরেন উত্তর দিল, "হাঁ, দু'জন ছাড়া।"

ইহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে ঝি যেন হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ললিতাকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্কুচিতস্বরে বলিল, "মা, জুতো পায়ে বিছানার উপর—"

ললিতা চমকিত ভাবে একবার লজ্জা-কাতর দৃষ্টিতে ঝির দিকে চাহিল; তারপর ব্যস্ততার সহিত জুতা দুইটা খুলিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া

দিল। ঝি বলিল, "কিছু মনে করোনা মা, মায়ের খেলা, খুব শুদ্ধাচারে থাকা দরকার। জুতো পায়ে দিয়ে বা রাস্তার কাপড়ে বিছানা ছুঁতে নাই।"

লজ্জায় ললিতার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে সরিয়া আসিয়া ভূপেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি বাড়ী গিয়ে খান দুই কাপড় পাঠিয়ে দাও দাদা।" তারপর ঝির দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপাতত তোমার একখানা কাচা কাপড় থাকে তো তাই দাও ঝি।"

ভূপেন বুঝিতে পারিল, নরেন যতদিন না সারিয়া উঠে, তত দিন ললিতা এস্থান ত্যাগ করিবে না। প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া ভূপেন কোন প্রতিবাদ করিল না। সে ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইল। ললিতা বলিল, "একজন ডাক্তার—"

বাধা দিয়া ঝি বলিল, "এ সব ব্যারামে ডাক্তারে কি করবে মা। এতে যা করেন মা, আর মায়ের কবরেজই এর তিকিচ্ছে জানে।"

ভূপেন বলিল, "আচ্ছা, ভাল কবিরাজই আনবো।"

বলিয়া সে প্রস্থান করিল। ললিতা কাপড় ছাড়িয়া ঝির একখানা আধ ময়লা কাপড় পরিয়া নরেনের কাছে বসিল, এবং শঙ্কিত ভাবে ঝিকে বলিল, "আমি যে রাস্তার কাপড়ে বিছানা ছুঁয়েচি, তার কি হবে?"

ঝি বলিল, "কি আর হবে মা, আমি সব গঙ্গাজল দিয়ে দিচ্চি। মা-ই আছেন, তাঁকে ডাক।"

ঝি বাহির হইয়া গেলে, নরেন চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি কেন এলে ললিতা?"

ললিতা বলিল, "আসাটা কি দোষের হয়েছে?"

নরেন বলিল, "আসা দোষের হয় নি। কিন্তু ঐ অশিক্ষিত ঝির কাছে তুমি—"

বাধা দিয়া সহাস্যে ললিতা বলিল, "মান অপমানের কথা বলছেন। কিন্তু তারও যে একটা সীমা আছে তা কি জানেন না, নরেন্ বাবু? জীবন মরণ যে সে সীমার বাইরে।"

নরেন আর কিছু না বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ললিতা ধীরে ধীরে তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে জ্বরটা এমন প্রবলভাবে হইল যে, তাহা দেখিয়া ললিতা ভীত হইয়া পড়িল। জ্বরের প্রকোপে নরেনের চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। ললিতা ও ঝি তাহার পাশে বসিয়া জাগিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইল।

পরদিন ভূপেন কবিরাজ লইয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ রোগী দেখিয়া বলিলেন, "গুটী সব চাপা পড়ায় জ্বরটা প্রবল হ'য়েছে। এই জ্বরের সঙ্গে গুটী যদি বা'র হ'য়ে যায় তবেই মঙ্গল। নয় তো অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে তা এখন বলা যায় না।"

কবিরাজ গুটী বাহির হইবার উপযোগী ঔষধ ও পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ভয়ে ললিতার মুখ শুকাইয়া গেল সে ঝিকে বলিল, "এমন হ'লো কেন ঝি?"

ঝি চিন্তিতভাবে উত্তর দিল, "কি জানি মা। মায়ের খেলা কে বুঝবে?"

শঙ্কিতস্বরে ললিতা বলিল, "কাল আমি অনাচারে বিছানা ছুঁয়েছি ব'লেই কি—"

বক্তব্য শেষ না করিয়াই ললিতা কাতর দৃষ্টিতে ঝির মুখের দিকে চাহিল। ঝি বলিল, "তাও হ'তে পারে। এসব খুব শুদ্ধাচারে থাকতে হয় মা, একটু অনাচার অবিচার হ'লে আর রক্ষা নাই।"

ললিতার যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শঙ্কাবিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায়?"

ঝি বলিল, "উপায় মা। এখন মা যদি রক্ষা করেন তবেই রক্ষা। মাকে ডেকে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাও।"

অন্য সময় হইলে ঝির এই ভিত্তিহীন নির্ভরশীলতায় ললিতা না হাসিয়া থাকিতে পারিত না, এবং দেবতার উপর এই অমূলক বিশ্বাসের প্রতিবাদ না করিয়া ছাড়িত না। আজ কিন্তু তাহার হাসি আসিল না, বরং এই নিতান্ত অনভিজ্ঞা ঝির ভ্রান্তবিশ্বাসের নিকট আপনার দৃঢ় বিশ্বাসটাকে খাটো করিয়া লইতেও ইতস্ততঃ করিল না। মুখে না ডাকিলেও সে নীরবে যেন ঝির উক্তিতেই সায় দিয়া গেল। প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না; কে যেন বুকের ভিতর চাপিয়া বসিয়া তাহার প্রতিবাদের সামর্থ্য রোধ করিয়া দিল।

কে জানে তাহারই দোষে পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছে কি না। রোগের হ্রাস বৃদ্ধির উপর কোন অশরীরী দেবতার হাত আছে কি? মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; সে সীমার বাহিরে অসীমের যে বিস্তৃত রাজত্ব রহিয়াছে, সেখানকার বাস্তব সংবাদ কে দিতে পারে? সেখানে দেবতা-নামধারী কোন শক্তিশালী আত্মা বসিয়া পার্থিব মানবের ভাগ্যচক্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছে কি না কে জানে। সুতরাং কে বলিতে পারে, তাঁহার স্পর্শেই নরেনের ব্যাধি তাহার জীবনকে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত করিয়াছে কি না।

সন্ধ্যার সময় কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এখনও যখন গুটী বাহির হইবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না, তখন পরিণাম কি হইবে তাহা সংশয়ের স্থল। শুনিয়া ললিতা কাঁপিয়া উঠিল। ঝি পাশে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "মা, মা, রক্ষা কর মা!"

ললিতা সে কাতর প্রর্থনায় যোগ দিতে পারিল না; শুধু স্তব্ধ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। বাহিরে স্থির হইলেও ভিতরে তাহার প্রাণটা যেন আছাড়ি বিছাড়ি করিত লাগিল। নরেন নিস্পন্দভাবে বিছানার

উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার চক্ষে পলক নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সাড়া নাই, শুধু বক্ষের মৃদু স্পন্দনেই জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরেখা পাণ্ডুর মুখখানার উপর পড়িয়া তাহাকে যেন আরও বিকৃত বিবর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ললিতা আর বসিতে পারিল না; আস্তে আস্তে উঠিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল।

ছাদ ঘন অন্ধকারে ঢাকা; মাথার উপর আকাশটাও অন্ধকার। চলিষ্ণু মেঘের পাশ দিয়া যে দুই একটা নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, তাহা যেন মৃত্যুর শাণিত দৃষ্টির মতই বোধ হইতেছে; বাতাসটা হা হা করিয়া ছুটিতে ছুটিতে বুকের ভিতর যেন একটা গভীর নৈরাশ্য জাগাইয়া দিতেছে; পাশের বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গলা মিলাইয়া কে গাহিতেছে—

"কত কাল আসিয়া কত ভাল বাসিয়া
গিয়াছিনু ফিরে কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া।"

ললিতা অবসন্নভাবে সেই অন্ধকার ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িল; কাঁদিতে কাঁদিতে আকুলকণ্ঠে ডাকিল, "ভগবান্, জীবনের বিনিময়ে যদি জীবন পাওয়া যায়, তবে সে জীবন দিতে আমি প্রস্তুত; তাই নিয়ে নরেনবাবুকে রক্ষা কর দয়াময়।"

নিজের আর্ত্তকণ্ঠস্বরে ললিতা নিজেই যেন কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় নীচে একটা গোল উঠিল। অনেক লোকের আগমন শব্দ, গোলমাল চীৎকার, স্ত্রীলোকের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর ললিতার কাণে আসিতে লাগিল। সে চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিল, এবং চোখ মুখ মুছিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

নরেনের ঘরের সম্মুখে আসিতেই ঝি বলিল, "হ্যাদে মা, কোথায় ছিলে তুমি? নরেনবাবুর বাড়ী থেকে সব এসে পড়েছেন। ঐ যে বৌমা—"

তার পর ঝি আর কি বলিল, ললিতা তাহা শুনিতে পাইল না; সে স্তব্ধ নেত্রে ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, অপর্ণা নরেনের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া স্থির প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে আশঙ্কা বা উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই, স্থির বিশ্বাসের মহিমায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ললিতা আত্মবিস্মৃতের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া অপর্ণার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, এবং দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমার পাপে নরেনবাবু যেতে বসেছেন; সতী লক্ষ্মী তুমি, তোমার পুণ্য দিয়ে তাঁকে রক্ষা কর।"

অপর্ণা বিস্ময়স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ললিতার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে উঠাইয়া প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার দোষ কি ভাই, এ আমার নিজের দোষের গুরু দণ্ড।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

"ললিতা !"

"আমি ললিতা নই।"

"তবে তুমি কি ঝি ?"

"না, আমি অপর্ণা।"

তিন দিন পরে নরেন চক্ষু উন্মীলন করিয়াছিল; সে শূন্য দৃষ্টিটা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। অপর্ণা মুখটা খুব নীচু করিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কষ্ট হচ্চে এখন ?"

উত্তরের আশায় অপর্ণা উৎকণ্ঠার সহিত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন কিন্তু কোন উত্তর দিল না, চোখ মেলিয়া চাহিলও না। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অপর্ণা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় পাখা নাড়িতে লাগিল।

ঝি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হ্যাদে মা, তুমি কেমনতর মেয়ে গা ? কাল সাঁজ পহরে বসেছ, আর আজ দু'পর গড়িয়ে যায়, উঠে মুখে হাতে জল দেবে না ?"

ঝির কথার কোন উত্তর না দিয়া অপর্ণা ব্যগ্রস্বরে বলিল, "এই মাত্র জ্ঞান হ'য়েছিল ঝি ?"

ব্যস্ততার সহিত ঝি বলিল, "হ'য়েছিল ? কথা কইলে নাকি ? কিছু বললে ?"

"না শুধু ললিতাকে ডাকছিলেন।"

ঈষৎ বিমর্ষভাবে ঝি বলিল, "তেনা তো কাল বেহুঁস জ্বর নিয়ে গিয়েছে। কেমন আছে কে জানে। বেহ্ম হ'লে কি হয়, মেয়েটী কিন্তু বড্ড ভাল। আহা, কি কাতরানি তা দেখেছ তো? এনাকে কিন্তু বড্ড ভালবাসে।"

অপর্ণার মুখের একটী শিরাও সঙ্কুচিত হইল না; সে ধীর প্রশান্ত স্বরে বলিল, "ভাল না বাসলে এমন ব্যারামে কেউ কি কাছে আসতে চায় বাছা?"

ঝি বলিল, "কাছে আসা কি, একেবারে যেন বুক দিয়ে পড়েছিল। তুমি আসতে যেন তার ধড়ে প্রাণ এলো।"

অপর্ণা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। ঝি কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "বসে রইলে যে? উঠে মুখে কিছু দাওনা। আর ভয় কি, কবরেজ কি বলে গেল শুনলে তো। যখন সব বেরিয়ে গিয়েছে, তখন আর কিছু ভয় নাই, মা রক্ষা করেছেন। তুমি এখন ওঠ দেখি।"

ঝি হাত ধরিয়া অপর্ণাকে তুলিয়া দিল, এবং আপনি তাহার স্থানে বসিল।

হঠাৎ নরেন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঝি, ঝি!"

"কেন বাবা?"

নরেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমি স্বপ্ন দেখ্ছিলাম, কে যেন আমার মাথার শিয়রে এসে বলছে, আর ভয় কি, আমি এসেছি।"

চমকিত ভাবে ঝি বলিল, "তাকে চেন না কি?"

নরেন বলিল, "একবার মনে হ'লো, যেন সে দেবতা। কিন্তু তার পর দেখলাম, তার মুখখানা ঠিক্ অপর্ণার মত।"

সহাস্যমুখে ঝি বলিল, "তুমি ঠিক্ দেখেছ বাবা, সে বৌমাই বটে।"

নরেন বিস্ময়-চকিত দৃষ্টিতে ঝির মুখের দিকে চাহিল। ঝি বলিল, "বৌমা যে আজ তিন দিন এসেছেন। তোমার ত জ্ঞান ছিল না বাবা। ওই তিন দিন তিন রাত বৌমা তোমার বিছানা ছেড়ে ওঠে নি।"

বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে নরেন শুধু বলিল, "তিন দিন!"

ঝি বলিল, "এই তিন দিন নিঃশ্বাসটুকু ছাড়া তোমার আর কিছুই তো ছিল না। কবরেজ পর্য্যন্ত ভয় খেয়ে গিয়েছিল। বৌমা কিন্তু একটুও ভয় পান নি; তিনি ঠায় এইখানে ব'সে সতীজাগরণ জেগেছেন।"

ইহা সত্য না পরিহাস? অথবা এখনও সে অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে। অপর্ণা—যে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই জানে না, যাহার নিকট সে এ পর্য্যন্ত ভক্তি বা ভালবাসার কণামাত্র লাভ করিতে পারে নাই, যাহাকে সে হৃদয়হীনা ভাবিয়াই আপনার হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে, সেই অপর্ণা তাহার রোগশয্যার পাশে বসিয়া সতী-জাগরণ জাগিয়াছে? দুরন্ত ব্যাধির ভীতিকে উপেক্ষা করিয়া অপর্ণা তাহার সেবা করিতে ছুটিয়া আসিবে ইহা কি সম্ভব? কেন আসিবে? প্রীতির পাত্রী হইলেও সে এক দিনের জন্যও যাহাকে বিন্দুমাত্র প্রীতি দিয়া মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই, সেই উপেক্ষিতা লাঞ্ছিতা অপর্ণা কোন্ আকর্ষণে, কি লাভের আশায় ছুটিয়া আসিয়া, প্রাণ মন ঢালিয়া তাহার সেবা করিবে? স্বপ্ন, স্বপ্ন, বিকারের প্রলাপ। নরেন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোরে চোখের পাতাগুলা চাপিয়া রহিল।

খানিক পরে হঠাৎ চোখ মেলিয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "ললিতা কোথায়?"

ঝি বলিল, "বৌমা আসবার পর তিনি চলে গিয়েছেন।"

নরেন পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। এমন সময় কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া রাখাল উপস্থিত হইল। রোগীর অবস্থা দেখিয়া কবিরাজ প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "রোগের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। এমন পরিবর্ত্তন প্রায় দেখা যায় না।"

ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "আর কোন ভয় আছে কবরেজ মশাই ?"

কবিরাজ বলিলেন, "ভয় তো একটুও নাই, বরং এক মাসের জায়গায় দশদিনে সেরে উঠবে এমনও আশা হচ্চে।"

সকলেরই মুখ আশা ও আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবিরাজ উপস্থিতমত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, রাখাল ডাকিল, "নরেন বাবু!"

নরেন ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিল। রাখাল বলিল, "কবিরাজের কথা শুনেছ বোধ হয়।"

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে নরেন বলিল, "তোমাদের কাছে আমি ঋণী রইলুম রাখাল।"

রাখাল বলিল, "সে ঋণ যতটা পার পরিশোধ ক'রে দিও, আমরা কিন্তু এক জনের ঋণ কিছুতেই শোধ দিতে পারবো না। বৌঠান যদি এসে না পড়তেন, তা হ'লে আমাদের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হ'ত। সেই সতীলক্ষ্মীর পুণ্যের জোরেই তুমি এ যাত্রা রক্ষা পেলে নরেন বাবু।"

নরেনের রোগ-পাণ্ডুর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রাখাল মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমাদের যখন ঋণ শোধের কোন উপায় নাই, তখন সে ঋণের ভারটা তোমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে তোমাকে আমাদের ঋণ হ'তে মুক্তি দিলাম।"

নরেনের ম্লান ওষ্ঠে প্রসন্ন হাস্যের রেখা মুহূর্ত্তের জন্য প্রকটিত হইল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই গভীর নৈরাশ্যে মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল।

রাখাল চলিয়া গেলে অপর্ণা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; ঝি উঠিয়া গেল। নরেন স্থির দৃষ্টিতে অপর্ণার প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্বামীর দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ?"

অন্ধকার আকাশতলে ক্ষীণ বিদ্যুতের দীপ্তির মত একটু ম্লান হাসি হাসিয়া নরেন উত্তর করিল, "কেমন থাকলে তুমি সুখী হও অপর্ণা?"

এ আবার কি নূতন সুর বীণার ললিত ঝঙ্কারের মত আসিয়া কাণে বাজিল। এমন সুরতো অপর্ণা কখন শুনে নাই। অপর্ণার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল; সে একটা কথাও বলিতে না পারিয়া নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। নরেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো অপর্ণা?"

"কি কথা?"

"তুমিই ব'লেছিলে, তুমি আমায় ঘৃণা কর।"

অপর্ণা নিরুত্তর। নরেন বলিল, "যাকে ঘৃণা কর, তার সেবা কত্তে এলে কেন?"

মৃদুস্বরে অপর্ণা বলিল, "দিদি আসতে বল্লেন।"

ঈষৎ হাসিয়া নরেন বলিল, "দিদি না বললে আসতে না তা হ'লে?"

অপর্ণার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল। হাস্য-প্রফুল্ল-স্বরে নরেন বলিল, "এতদিন আমাকে ভুল বুঝিয়ে রেখেছিলে অপর্ণা, কিন্তু

পরের হুকুমে মরাকে বাঁচাতে এসেছ, এত বড় ভুলটা কিছুতেই ছাপিয়ে রাখতে পারবে না।"

অপর্ণা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া নরেন বলিল, "শুধু আমার ভুল ভাঙ্গে নি অপর্ণা, একটা মিথ্যা ভ্রমের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তুমি নিজের নারীত্বের সঙ্গে এতদিন যে কঠোর সংগ্রাম ক'রে এসেছ, আজ বোধ হয় তারও অবসান হ'য়েছে। তুমিও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, শুচিত্ব অশুচিত্ব, আচার বিচার, কোনটাই নারীত্বের কাছে বড় নয়।"

অপর্ণার চোখের কোণ ছাপিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ললিতা প্রবল জ্বর লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ফিরিলে ভূপেন শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হ'য়েছে নাকি ললি?"

ললিতা কোন উত্তর দিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। ভূপেন পাশে বসিয়া তাহার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া শঙ্কিতস্বরে বলিল, "বড্ড জ্বর যে।"

ললিতা চাদরে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। খানিক পরে মুখের কাপড়টা সরাইয়া দেখিল, ভূপেন বিছানার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ললিতা ঘাড় তুলিয়া একটু ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, "তুমি এখনো বসে আছ দাদা?"

ভূপেন বলিল, "তোর জ্বরটা বড্ড বেশী হ'য়েছে ললি, বোধ হয় ১০৩ হবে।"

ললিতা বলিল, "তা হোক, তুমি উঠে যাও।"

ভূপেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কেন বল্ দেখি?"

ললিতা জোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, আমার কাছে তোমার থাকতে হবে না।"

সহাস্যে ভূপেন বলিল, "আচ্ছা, তুই এখন একটু ঘুমো, আমার তরে তোকে এত ভাবতে হবে না।"

ললিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি আগে উঠে যাও বলছি দাদা, নয় তো আমি কিছুতেই শোব না, আমি মেজেয় মাথা কুটে রক্তগঙ্গা হব।"

ভূপেন বুঝিতে পারিল, ললিতা মনে করিয়াছে, নরেনের সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; ভূপেন কাছে থাকিলে তাহারও এই দুরন্ত ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কাতেই সে এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এই আশঙ্কা-জনিত উত্তেজনাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইল; শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আমি চলে যাচ্চি, তুই শুয়ে পড়।"

ললিতা অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলে ভূপেন বাহির হইয়া ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিল।

জ্বর অনেকটা ললিতার নিজের দোষেই হইয়াছিল। দুই দিন দুই রাত্রি জাগরণে মাথাটা যখন ধরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কলে মাথা দিয়া বেশ করিয়া স্নান করিল; ঝির নিষেধ শুনিল না। স্নানান্তে মাথাধরা ছাড়িল না, বরং মাথা আরও ভারী হইয়া আসিল। তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সে নরেনের কাছে গিয়া বসিল। নরেনের তখন অজ্ঞান অবস্থা; মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছিল। ললিতা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ নরেন বলিয়া উঠিল, "কে তুমি?"

ললিতা বলিল, "আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না?"

উগ্রকণ্ঠে নরেন বলিল, "চিনেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? জান, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।"

ললিতা আরক্তমুখে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে তাহার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকে ছুঁয়ো না, উঠে যাও।"

ললিতা হাত গুটাইয়া লইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল নরেনবাবু তাহাকে ঘৃণা করেন? এটা সত্য না প্রলাপ? অথবা অনেক সময়ে

প্রলাপের ভিতর দিয়াই কঠোর সত্যটা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ললিতার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল, চোখ মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। নরেন পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।"

ললিতার ভ্রূ ললাট কুঞ্চিত হইল; সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, অপর্ণা ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অপর্ণার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ব্যস্ত-ভাবে উঠিয়া পড়িল, এবং দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া ললিতা দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার মাথা যেন ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। রেলিং ধরিয়া আস্তে আস্তে বারান্দার এক পাশে গিয়া সে অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র তাহার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

যখন সংজ্ঞা হইল, তখন মাথা এত ভার যে, উঠিতে গিয়াও উঠিতে পারিল না; যেন অবশভাবে হাতের উপর মাথাটা রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। সহসা পাশের ঘর হইতে কথোপকথনের শব্দ কাণে আসিল। অপর্ণার সহিত যে ঝি আসিয়াছে, সে মেসের ঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "ঐ বেহ্ম মেয়েটাই তো যত নষ্টের মূল; ওর তরেই তো মা ঠাকরণের সাথে বাবুর এত ঝগড়াঝাটি। মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত আছে কি? তা হাজার হোক সোয়ামী তো বটে, আর ছেলের অসুখ ব'লে বড় মাও আসতে পারলেন না; কাজেই ওনাকে ছুটে আসতে হ'লো। তা কি বলবো বোন, মা ঠাকর'ণ ভদ্দর বামুনের ঘরের মেয়ে বলেই শুধু সাঁথে কথা কইতে, আমরা হ'লে তো—"

ললিতার কাণের ভিতর যেন জলন্ত শলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে উঠিয়া সেখান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা তুলিতেই আবার ঢলিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল।

খানিক পরে ঝি আলো হাতে লইয়া কাছে আসিয়া ডাকিল, "হ্যাঁ গো মা, এখানে ঠাণ্ডায় তুমি পড়ে আছ? ঘরে উঠে এস।"

"না, আমার বড় মাথা ধরেছে" বলিয়া ললিতা মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। ভোরের সময় শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিল; পরিধেয় খানা মুড়ি দিয়া ললিতা শীতে কাঁপিতে লাগিল।

সকালে ঝি আসিয়া বলিল, "তোমার জ্বর হ'য়েছে নাকি মা?"

ললিতা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "শীগ্‌গীর গাড়ী একখানা ডেকে দাও।"

ঝি গাড়ী ডাকিয়া আনিলে ললিতা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। আসিবার সময় নরেনের ঘরের সম্মুখ দিয়া আসিলেও ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না।

উঃ, সে কি ভুলটাই করিয়াছে! তাহার জন্য স্ত্রীর সহিত নরেনের মুখ দেখাদেখি নাই? কেন? তাহার সহিত নরেন বাবুর সম্বন্ধ কি? অথচ তাহাকে লইয়া একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছে। ছি ছি, সামান্য ঝি পর্য্যন্ত তাহার নামটা এমন ঘৃণার সহিত উচ্চারণ করিল যে, তাহা যে কোন ভদ্রমহিলার পক্ষে অসহ্য। কিন্তু তাহাও কাণ পাতিয়া শুনিতে হইল! ললিতার মাথার ভিতর যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কেন সে অযাচিত ভাবে সেবা করিতে আসিল? এই অযাচিত উপকারের ফলে এমন তীব্র নিন্দা, কুৎসিত অভিযোগ লইয়া যে ফিরিতে হইবে ইহা সে জানিত না; জানিলে বোধ হয় আসিত না। এই কুৎসিত অভিযোগ

দাদার কাণে গেলে তিনি কি মনে করিবেন? চম্পটী সাহেবের সম্মুখেই বা সে কোন্ মুখে বাহির হইবে? যে গর্ব্ব লইয়া সে চম্পটী সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়াছিল, সে গর্ব্ব কি এখন চম্পটী সাহেবের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া দিবে না? উঃ কি বিষম ভ্রম সে করিয়াছে!

ইহার উপর ললিতার আশঙ্কা হইল, তাহার খুব প্রবল জ্বরই হইয়াছে, এবং এই জ্বরের পরিণাম যে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ললিতার বড়ই ভয় হইল। ভয় শুধু নিজের জন্য নয়, ভূপেনের জন্যই বেশী ভয় হইল। তাহার সেবা করিতে গিয়া ভূপেন যদি এই কাল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়? যদি হয় কেন, নিশ্চয়ই হইবে। ললিতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ গেলেও সে ভূপেনকে কাছে আসিতে দিবে না। নিজের ভুলের দণ্ড নিজেই মাথা পাতিয়া লইবে।

ভাবিতে ভাবিতে ললিতা ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অপরাহ্ণ। ললিতা চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই পাশে চম্পটী সাহেবকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চম্পটী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছ?"

ললিতা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখানে কেন বলুন তো?"

চম্পটী সাহেব নিরুত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র। উত্তেজিত ভাবে ললিতা বলিল, "আপনি উঠে যান, আমার কাছে কারো থাকতে হবে না।"

সহাস্যে চম্পটী সাহেব বলিলেন, "তুমি উঠতে বললেও উঠতাম না। কিন্তু তোমার ভয় নাই, এই মাত্র ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি বলে

গেলেন, সামান্য জ্বর মাত্র, মানসিক উত্তেজনায় এতটা দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া আর কোন আশঙ্কা নাই।”

ললিতা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নরেন একটু সুস্থ হইয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় মহামায়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আর এলে কেন বৌদি ?"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া উত্তর করিলেন, "তুমি সেরে উঠেছ তাই তোমাকে দেখতে এলাম।"

লজ্জিত ভাবে নরেন বলিল, "আমার সঙ্গে এ পরিহাস কেন বৌদি ? তুমি যে আগে কেন এস নাই, তা কি আমি বুঝতে পারি নাই ?"

সহাস্যে মহামায়া বলিলেন, "তা হ'লে বুঝেছ ?"

নরেন বলিল, "তুমি এমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও আমি বুঝতে পারবো না, আমাকে কি এতই নির্ব্বোধ মনে কর ? তুমি যে কি উদ্বেগ বুকে চেপে শুধু আমার চোখ ফুটিয়ে দেবার জন্য ঘরে বসে-ছিলে সেটা বুঝতে আমার বাকী আছে ? আমি কি তোমাকে চিনি না বৌদি ?"

নরেনের কণ্ঠস্বর গাঢ়, চক্ষুপল্লব আর্দ্র হইয়া আসিল। মহামায়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। নরেন আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আমি দু'এক দিনের মধ্যেই দেশে যাব স্থির ক'রে ছিলাম।"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "আবার সেই ম্যালে-রিয়ার রাজ্যে যাবে ?"

নরেন লজ্জায় মস্তক নত করিল। মহামায়া বলিলেন, "তা তুমি

যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, আমি তোমার কাছে আসি নাই; আমি এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে।"

"নিমন্ত্রণ!" বলিয়া নরেন বিস্ময়-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মহামায়া আঁচলের খুট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া নরেনের হাতে দিলেন। নরেন পত্রখানা খুলিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতে লাগিল।

"দিদি তোমার চিঠি পেয়েছি। ইনি অনেকটা সেরে উঠেছেন, কিন্তু এখনো বড় দুর্ব্বল। এদিকে দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। ডাক্তার বলছে, এ অবস্থায় দেশে যাওয়া ভাল নয়, পশ্চিমে কোথাও দিন কতক বেড়িয়ে এলে ভাল হয়। ওঁর কিন্তু মত নাই, উনি বলেন দেশে গেলেই সব সেরে যাবে। আমার কথা শুনবেন না। তুমি একবার এলে খুব ভাল হয়। তোমার কথা বোধ হয় ঠেলতে পারবেন না।

তুমি না এলে চলবেই বা কেমন ক'রে দিদি? যদি পশ্চিমে কোথাও যেতে হয়, তুমি সঙ্গে না থাকলে চলবে কেন? আমি এখানে এসেছি বটে, কিন্তু তুমি সঙ্গে না গেলে বিদেশে কোথাও যেতে পারব না। তুমি শীগ্‌গীর পার আসবে, নয় তো কোথাও যাওয়া হবে না।"

পত্র পাঠ শেষ হইলে নরেন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "এই বুঝি তোমার নিমন্ত্রণ?"

ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "এখন কোথায় যাওয়া হবে ঠিক কর দেখি।"

নরেন কিন্তু সহজে যাইতে সম্মত হইল না, মহামায়াও ছাড়িলেন না। অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষে মহামায়ারই জয় হইল। সকলে মধুপুর যাত্রা করিল। নরেন ঝিকে সঙ্গে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। ঝি কিন্তু গেল না; সে বলিল, "না বাবা, তুমি যে সেরে উঠেছ এই

আমার ভাগ্যি। কিন্তু আমি চলে গেলে এখানে বাবুদের দেখবে কে ?”

এক মাস মধুপুরে থাকিয়া নরেন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। মহামায়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন নরেন বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল; সহসা পশ্চাৎ হইতে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান আসিল, “নরেন বাবু!”

নরেন চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাহিতেই পশ্চাতে ললিতা ও চম্পটী সাহেবকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চম্পটী সাহেব ছুটিয়া আসিয়া নরেনের হাত দুইটা ধরিয়া খুব একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তার পর উল্লসিত কণ্ঠে বলিলেন, “এসময়ে এখানে আপনাকে দেখ্‌তে পাবার আশা আমরা মোটেই করি নাই নরেন বাবু।”

বলিয়া তিনি পশ্চাতে ললিতার দিকে সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। নরেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “আমি প্রায় একমাস এখানে চেঞ্জে এসেছি।”

চম্পটী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “ললিতারও তাই। তবে উনি এই সঙ্গে ‘লাইফ’ টাকেও ‘চেঞ্জ’ ক’রে ফেলচেন।”

ললিতা তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। নরেন তাহার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতেই সে মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিল। চম্পটী সাহেব হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, “কাল আমাদের বিবাহ। আপনি উপস্থিত থাকলে ললিতার বোধ হয় আনন্দের সীমা থাকবে না।”

ললিতা শান্ত প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল, “চম্পটী সাহেবের অনুমান খুবই সত্য নরেন বাবু। আপনাকে যেতেই হবে। তা ছাড়া—”

একটু থামিয়া ললিতা পুনরায় বলিল, "তা ছাড়া বৌদিদিকেও যেতে হবে। চলুন তাঁকে একেবারে নিমন্ত্রণ করে যাই।"

নরেন তাহাদিগকে লইয়া বাসায় উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীর ভিতর গিয়া অপর্ণা ও মহামায়াকে ললিতার আগমন সংবাদ ও বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। ললিতা অপর্ণার সম্মুখে গিয়া বলিল, "সে আমি কিছুতেই শুনবো না বৌদি, ব্রাহ্ম হই, ক্রিশ্চান হই, তোমাকে যেতেই হবে। কেন না এই বিবাহে আমাদের একটা মস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে।"

অপর্ণা তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "সে নিষ্পত্তি তো আগেই হ'য়ে গিয়েছে বোন্, আর তুমিই তা ক'রে দিয়েছ।"

অপর্ণার হাস্যসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া নরেন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্পূর্ণ।